মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১ – ১৫ নভেম্বর ১৯৮৪



খেলায় মেয়েরা পুরুষদের অতিক্রম করবে?

চাকুরে মেয়েদের সমস্যা

আমেরিকায় মেয়েরা কি কেবল আনন্দের সামগ্রী?



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


রোদ-হাওয়ায় বেপরোয়া, শীত-গ্রীষ্ম
বারোমাস হাসিখুশি, তরতাজা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল
এই ত্বকের সাথী বোরোলীন।
রোরোলীনের কোমল যত্ন—শুষ্কতা
আর গা-হাত-পা ফাটা,
র‍্যাশ বেরোনো বা রোদে
ঝলসানোর থেকে
খেলাধুলোর সাথী
ত্বককে রক্ষা করে।
বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক
ক্ষমতা রোজকার সাধারণ
কাটা ছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
BOROLINE
ত্বকের সুরক্ষার জন্য সত্যিই
কার্যকরী ক্রীম
GD
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
লিমিটেড
আশা মহল নিউ আলিপুর
কলকাতা ৭০০ ০৮৮
HTC-GDP-5194

সুকন্যা

বর্ষ ১ সংখ্যা ১০/১-১৫ নভেম্বর ১৯৮৪/১৫-২৯ কার্তিক ১৩৯১

সম্পাদকীয়

একসময় এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। শাস্ত্রের উল্লেখ, অনুশাসন দেখিয়ে বাল্যবিবাহকে এমন-এক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, যেন এর তুল্য পুণ্যকর্ম আর হয় না। সতীদাহের মত বাল্যবিবাহও একদিন আইনমতে নিষিদ্ধ হয়েছে, যদিও এই আইনের বয়েস খুব বেশি নয়। সারদা আইন পাশ হয়েছে ১৯২৯ সালে। তবু সে তো অর্ধ শতাব্দীরও বেশি হয়ে গেল। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে নাবালিকা বিবাহ সামাজিকভাবে বন্ধ হয়নি। গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র সমাজের মধ্যে এর প্রচলন এখনও কম নয়। যেমন, সম্প্রতি একটি খবরে বলা হয়েছে যে, রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে নাবালিকা বিবাহের সংখ্যা অনেক বেশি। এমনকি যিনি একদিন বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, সেই হরবিলাস সারদার গ্রামেই সর্বাধিক মাত্রায় বাল্যবিবাহ ঘটেছে।

আমাদের দেশ দরিদ্র। দেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অক্ষম সমাজের কাছে যে-কোনো সন্তানই উপার্জনের উপায় রূপে গণ্য হয়। অল্প বয়েস থেকেই আমরা নাবালকদের সংসারের স্বার্থে উপার্জনের কাজে লাগাই। সমাজতাত্ত্বিকরা হয়ত বলবেন, নাবালিকা বিবাহের দ্বারা সমাজের এক অংশ উপার্জনের পথ কিছুটা সুগম করে। হয়ত এই ব্যাখ্যায় সত্য রয়েছে, তবু আজকের দিনে একাধিক কারণে এই ধরনের বিবাহ আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। যেসব কারণে নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল, সেই কারণগুলির কোনটাই উপেক্ষা করার নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য এবং শিশুমৃত্যুর হারের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে নাবালিকা বিবাহের দ্বারা আমরা অসংখ্য মেয়ের আর তাদের সন্তান-সন্ততির ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছি।

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

সূচীপত্র



প্রচ্ছদের ছবি : লস এঞ্জেলেসে মেয়েদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ডোরিও গাব্রেলা (২২৬) ও তৃতীয় পুইসা মারকিকা (৩১৬)।

ফটো : অমিয় তরফদার

মতামত

'সুকন্যা' আমাদের নানাভাবে সাহায্য করুক

মহিলাদের একমাত্র নিজস্ব বাংলা পত্রিকা 'সুকন্যা' আমাদের অনেক কিছুই দিতে পারে। তবে 'সুকন্যা' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। মহিলাদের এই পত্রিকাটি মা ঠাকুমা ও ষোল বছরের মেয়ে সকলেরই।

সেজনাই বলতে চাই যে বটতলার বাজে গল্প ও উপন্যাসের কোনো দরকার নেই 'সুকন্যা'য়। মদ-মেয়েমানুষ ও কিছু অশ্লীল কথাবার্তা না হলে যখন গল্প-উপন্যাস রচনা হয় না – তখন 'সুকন্যা' এই সব বাজে উপাদান বহন করবে কেন? 'সুকন্যা'র অনেক দায়-দায়িত্ব। আমাদের সবরকম ভাবে সাহায্য করতে পারে 'সুকন্যা'। 'সুকন্যা'ই মহিলাদের সুখদুঃখের ভার নিতে পারে। নারীর জীবনের সত্যকার কত ঘটনা তো দৈনন্দিন-এর উপন্যাস হতে পারে। নারী কি করে তার জীবনের বিড়ম্বনা এড়াতে পারে, পণপ্রথার কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে, সবচেয়ে বড় কথা নিত্য বধূহত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে এরকম অনেক সমস্যার কথা বলতে পারে 'সুকন্যা'। এছাড়া সুগৃহিণীর গুণাবলীর কথা, রান্নাঘরের কথা, ঘর সাজানো, নিজেকে সাজানো বা প্রসাধন – এসব বিষয় তো আছেই। আর মনীষীদের কথা, মহিলাদের কৃতিত্বের কথাও সে জানাতে পারে। তারপর ভ্রমণবৃত্তান্ত কত বলার আছে, জানাবার আছে। মর্মস্পর্শী সত্যিকার ঘটনার ভালো উপন্যাস। আর এই ৬৪ পাতার পত্রিকাটির অধিকাংশ পাতাতেই যদি সিনেমার ফটো থাকে তবে এসবে কি সুকন্যার কোনো প্রয়োজন আছে? মহিলারা সিনেমার ভক্ত ঠিকই। তবুও সিনেমার একটু-আধটু থাকতে পারে। অত দরকার কি?

আমাদের আদরের 'সুকন্যা' আমাদেরই সুখদুঃখের সংগী হবে, এই কামনা করি।

গায়ত্রী দেবী, কৃষ্ণা বসু, সুমিত্রা ঘোষ, উর্মি, সবিতা, লিলি মুখার্জি, বিনতা চৌধুরী, গৌরী চৌধুরী, বাণী রায়, মঞ্জুশ্রী মিত্র ও ছন্দা ঘোষ
কলকাতা-৫৫

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার চাই

আমি 'সুকন্যা'র নিয়মিত গুণমুগ্ধ পাঠক। পত্রিকার সম্পাদিকা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা হলেও পুরুষদের পড়তে বাধা নেই। পড়ে সত্যিই ভাল লাগল। সম্পাদিকাকে অনুরোধ করছি, বাংলা চিত্র-মঞ্চ জগতের অবিস্মরণীয় নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের তথ্য-পূর্ণ সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক রচনা প্রকাশ করুন।

নির্ঝর দাশগুপ্ত
কলকাতা-১৫

বাংলায় নতুন

বহু আকাঙ্ক্ষিত মহিলাদের নিজস্ব পত্রিকা 'সুকন্যা'র সংখ্যাগুলো পড়লাম। বাংলা ভাষায় মহিলাদের নিজস্ব কোনো পত্রিকা ছিল না এজন্য আমরা অর্থাৎ বোম্বাইয়ের প্রবাসী বাঙালীরা প্রচণ্ড দুঃখ অনুভব করতাম। যেহেতু এখানে হিন্দি, মারাঠী ও ইংরেজীতে নানারকমের মহিলা পত্রিকা আছে, অথচ বাংলায় এরকম পত্রিকা নেই।

আপনারা 'সুকন্যা' প্রকাশ করে আমাদের মত প্রবাসী বাঙালীদের নিজস্ব পত্রিকার অভাব মেটালেন। এইজন্য আপনাদের জানাই অভিনন্দন।

এই পত্রিকার মধ্যে সেলাই, ঘর সাজানো, রান্না, ব্যায়াম, রূপচর্চা ও চাকরি প্রভৃতি নানা বিষয় জানতে পারা যাবে, তাই খুব খুশি হলাম। কিন্তু রূপচর্চার কলমে সব আশা মেটেনি। সুতরাং পরের সংখ্যাটি আরও আকর্ষণীয় হবে, আশা রাখছি।

পত্রিকাটি সর্বাংগসুন্দর হয়েছে চারিদিক থেকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে এই পত্রিকাটি শোভাবর্ধন করুক এবং সকলের কাছে সমাদর লাভ করুক। এই কামনা করছি।

[illegible] তন্দ্রা খামারু
বোম্বে-১০

প্রসঙ্গ : কবিতা

[illegible] সমস্যা [illegible] 'সুকন্যা'কে পেলাম এক পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপির মতো যেখানে মেয়েদের জীবন-সম্পর্কিত নানা কথা প্রকাশ পাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই। এত দিনে আমাদের একটা নিজস্ব পত্রিকা বের হল। খুব দরকার ছিল এমন একটা পত্রিকার। আচ্ছা, এই পত্রিকায় কবিতার একটা বিভাগ খুললে কেমন হয়?

মৌসুমী গাঙ্গুলী
কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা

কয়েকটি অনুরোধ

'সুকন্যা'র ১৬-১৩ আগস্ট পড়লাম। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে উত্তরবঙ্গের মেয়ে ও গৃহবধূদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে একটি উপযুক্ত পরামর্শের পত্রিকা হতে পেরেছে। এই পত্রিকা পেয়ে আমরা সত্যিই গর্ব অনুভব করছি। মেয়েরা যে সমাজের উপেক্ষিত নয় – তাই এই পত্রিকা থেকে আমরা বিশেষ করে উপলব্ধি করছি। আমার মনে হয়, গ্রামের মেয়েদের কাছে 'সুকন্যা' একটি অমূল্য পত্রিকা।

আমার কয়েকটি অনুরোধ নিবেদন করলাম ঃ

১। 'সুকন্যা' পাক্ষিক না করে সাপ্তাহিক করলে কেমন হয়?

২। 'সুকন্যা'র গল্পগুলি মহিলা লেখিকার হলে ভাল হয়।

৩। 'মেয়েদের রূপচর্চা' প্রতি সংখ্যায় থাকলে ভাল হয়।

৪। গৃহবধূ ও মেয়েদের বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা মাঝে মাঝে থাকলে ভাল হয়।

শিখা রাহা
শিলিগুড়ি

॥২॥

'সুকন্যা'য় ভারতের অতীত ও বর্তমানের কৃতী মহিলাদের ছবিসহ জীবনী থাকলে ভাল হয়। স্বনামধন্যা মহিলা চিকিৎসকদের লেখা থাকলে সাধারণ মহিলাদের অনেক উপকার হয়। জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে মহিলাদের উল্লেখ-যোগ্য অগ্রগতি ও অবদান সম্পর্কিত মনোগ্রাহী লেখা আরও প্রকাশ করা দরকার। দেশ, জাতি ও পরিবারের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক চেতনার সৃষ্টি ও প্রসার করা একটি মহিলা পত্রিকার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই মনে করি।

জগদীশ দাস
চাকলা, ২৪ পরগনা

আঠারো বছরের সেই মেয়েটি আজ বিয়ের আসরের লাজুক কনে

এই ছোট্ট মেয়েটি গতকালও মাঠে-ঘাটে খেলে বেড়িয়েছে। আর আজ, সে পৌঁছে গিয়েছে এক নতুন জীবনের আঙিনায়। তার এই আনন্দের অংশীদার–পিয়ারলেসও।

মেয়েটির জন্মের পর থেকেই তার বাবা ছিলেন দুশ্চিন্তায়। মেয়েকে বিয়ে দিতে হ'লে যে টাকার দরকার–তা' তিনি পাবেন কোথায় ?

ঠিক সেই সময়েই পিয়ারলেস বাড়িয়ে দিয়েছিল সহযোগিতার হাত। পিয়ারলেসের সমাজকল্যাণ প্রকল্পগুলি এমনভাবেই তৈরী যাতে ওঁর মতো স্বল্প আয়ের লোকেরা তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতে পারেন এবং তাঁদের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে পারেন।

পিয়ারলেসের মাধ্যমে সঞ্চয় করে প্রকারান্তরে তাঁর টাকা তিনি গচ্ছিত রেখেছেন সরকারী তহবিলেই। তাই তাঁর জমানো টাকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ। আজ বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি আজ তাই বিয়ের আসরের লাজুক কনে।

মোট সম্পদ
৫০০ কোটি
টাকার ঊর্ধ্বে

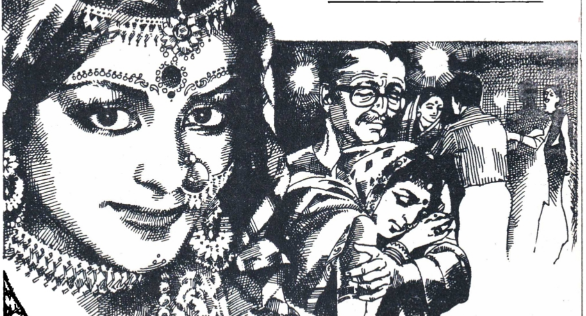
®

স্থাপিত ১৯৩২

দি পিয়ারলেস
জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড
ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন,
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা- ৭০০ ০৬৯

ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান



PRASA PGF 119/84

আমেরিকায় মেয়েরা কি কেবল আনন্দের সামগ্রী?

শিকাগো থেকে
নীতা মজুমদার

উপরাষ্ট্রপতি পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে জেরালডিন ফেরারোর মনোনয়ন আমেরিকায় ঐতিহাসিক ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছে। প্রথম মহিলার এই সম্মান লাভে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের বিখ্যাত সব পত্রপত্রিকায় জেরালডিনের বক্তৃতা, তাঁর জীবনী এমনকি তাঁর পোশাক-আশাক, চুলের কায়দা সবই বিস্তৃতভাবে ছাপা হয়েছে। জেরাল্ডিনের মনোনয়ন ওয়াল্টার মণ্ডেলকেও নির্বাচনী প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। জেরালডিন আজ এমনই জনপ্রিয় হয়েছেন যে মায়েরা তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জেরালডিনকে দেখাতে নিয়ে গেছেন এবং তাঁকে একবার স্পর্শ করিয়ে নিয়েছেন যাতে পরে ছেলেমেয়েদের বলতে পারেন '১৯৮৪-তে যে প্রথম মহিলা উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পান তুমি তার হাত ধরেছিলে।'

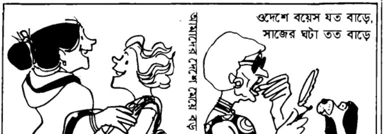
এইসব ঘটনা শুনে তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের মুখে নিশ্চয় হাসির রেখা দেখা দেবে। ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনয়ন পান এমনকি যখন সেই পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন আমরা এটা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করিনি। তিনি যে একজন মহিলা সেটা কখনোই বড় হয়ে দেখা দেয়নি, লোকে তাঁর অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা এবং বিচক্ষণতার বিচারই করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কতদূর সফল হয়েছেন সে নিয়ে হয়ত নানা মত আছে কিন্তু তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে যে কোনো মতাবলম্বীই তাঁকে মহিলা হিসাবে বিচার করবেন না, সকলেই তাঁকে রাজনীতিজ্ঞ এবং নেত্রীর চোখেই দেখবেন। আমেরিকার দৃশ্যটা কিন্তু বিপরীত। জেরালডিনকে নিয়ে এত হৈচৈ তিনি মহিলা বলেই। বলতে দ্বিধা নেই জেরালডিন নিজেও তাঁর মনোনয়নকে মহিলা হিসাবেই বড় করে দেখেছেন। তিনি বারবার বলেছেন তাঁর মনোনয়ন প্রমাণ করেছে মহিলাদের স্বাধীন হওয়ার অধিকার আছে, মহিলারাও অনেক উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, মহিলারা যে কোনো কাজ করার ক্ষমতা রাখেন।

এই সত্যটা কিন্তু তাঁরা আবিষ্কার করলেন আমেরিকার স্বাধীনতার প্রায় ২০০ বছর পর। অথচ বেশ নিঃশব্দেই ভারতবর্ষে এই ঘটনা ঘটে স্বাধীনতার মাত্র ২০ বছর পর। এই ব্যবধানে কি প্রমাণিত হয়?

ওদের এই প্রচারের ব্যাপারটা অনেকটাই 'লোক দেখানো'। আমেরিকানরা আড়ম্বর পছন্দ করেন, তাঁদের সবকিছুই বিশাল, জাঁকজমকপূর্ণ, ঐতিহাসিক এবং নাটকীয়। তাঁরা জানেন দেশপ্রেম এবং কিছু দেশাত্মবোধক কথা বলে খুব সহজেই সাফল্য অর্জন করা যায়। এমনকি সাধারণ দাঁত মাজার পেস্টকেও 'আমেরিকানদের জীবনে বিপ্লব' বলে বিক্রি করা হয়। তার ব্যবহার গড়ে তোলে বিশুদ্ধ আমেরিকান নাগরিক। চুইং গাম বা যে কোনো পানীয়কে বিজ্ঞাপিত করা হয় আমেরিকার সামাজিক জীবনের খুশি আর আনন্দের প্রতীক হিসাবে। যে গাড়ি চড়ে আমেরিকায় বেড়িয়ে আনন্দ নেই, তার বিক্রি নেই। আত্মপ্রচার, আত্মপ্রশংসা করে নিজেদের জাহির করা আমেরিকানদের স্বভাবগত।

জেরালডিন ফেরারো অনেক বছর ধরেই 'কংগ্রেস ওম্যান' ছিলেন যেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদ। উনি ছাড়া আরো অনেক 'কংগ্রেস ওম্যান' এবং সেনেটের মহিলা সদস্যা আছেন। মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও আছেন। রাজনীতি করেন এমন মহিলাও প্রায় সব স্তরেই আছে। ১৯৭৯-৮৩ পর্যন্ত শিকাগো শহরের মেয়র ছিলেন একজন মহিলা, এছাড়া আরো ২৬ জন মহিলা মেয়র আছেন শিকাগো শহরের আশেপাশে ছোট ছোট শহরগুলোতে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও একজন মহিলা, নাম হান্না গ্রে। এ হল শুধুমাত্র প্রশাসনিক এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত পদগুলোর কয়েকটি নমুনা। শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে এমন বহু কৃতী আমেরিকান মহিলা আছেন।

রাজনীতিতেও ফেরারো সেই অর্থে কোনো নতুন পথের সন্ধান দেননি। তবে কেন এই উত্তেজনা? এর খানিকটা বোধহয় আমেরিকানদের নাটকীয় উত্তেজনা ভালবাসার জন্য। তাঁদের যান্ত্রিক জীবনে তাঁরা হয়ত এইভাবেই বৈচিত্র্য আনতে চান। আর বাকিটা সত্যিই মহিলার কৃতিত্বের জন্য। এর আগে আমেরিকার জনজীবন এবং ভাবনায় মহিলারা এতটা স্বীকৃতি পাননি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল ই আর এ (ইক্যুয়াল রাইটস অ্যামেন্ডমেন্ট) সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও বহুকাল ধরেই আমেরিকায় মহিলাদের জন্য যে কোনো কাজের দরজা খোলা তবুও একই পদে কাজ করে পুরুষদের থেকে মহিলারা কম মাইনে পাচ্ছিলেন। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই এটা



একটা অলিখিত নিয়ম ছিল। এখন অবশ্য এই ধরনের বৈষম্য অনেক কমে আসছে। একজন মহিলা তো মামলা করে তাঁর ন্যায্য অধিকার আদায় করেছেন। ক্রিস্টিন ক্র্যাফট নামে এই টিভি সাংবাদিকের অভিযোগ ছিল যে শুধুমাত্র মুখশ্রীতে বয়সের ছাপ পড়ায় তাঁকে নিচু পদে নামিয়ে দেওয়া হয় যা কখনো পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শেষ পর্যন্ত মামলায় জিত হয় ক্রিস্টিনের। দশ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ সহ তাঁকে আরো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। সম্প্রতি প্রায় দেড় হাজার মহিলা – যাঁরা বিমান সেবিকার কাজে নিযুক্ত, পুরুষদের সঙ্গে বৈষম্যের দরুন মামলা করেন। বিমান সেবিকাদের চাকরির প্রধান শর্ত ছিল অবিবাহিত থাকতে হবে অথচ বিমান সেবকদের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো বাধা-নিষেধ নেই। শুধু আমেরিকায়ই বিমান সেবক নেওয়া হয় অথচ বিমান সেবিকাদের নিয়ম তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। মামলায় জেতার ফলে যেসব বিমান সেবিকা বিয়ে করার জন্য চাকরি হারিয়েছিলেন তাঁদের পুনর্বহাল করা হয় এবং ৩৮ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণও দিতে হয় বিমান কোম্পানিকে।

আমেরিকার এই পুরুষ-মহিলা বৈষম্যবোধ যথেষ্ট লজ্জাজনক। ভারতবর্ষ তার মহিলা নেত্রীদের নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। যদিও সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে এখনো সামাজিক এবং নৈতিক চেতনা তত প্রখর নয়। শিকাগোয় যে অল্প কয়েকজন ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞ আছেন তাঁদেরই একজনের অফিসে সেদিন বসে ছিলাম। তিনি 'রিসেপশনিস্ট' চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তারই উত্তরে এক মহিলা ফোন করলেন। ভদ্রলোক তাঁর আবেদন নাকচ করে দিলেন শুধু এই অভিযোগে যে মহিলার একটা ছোট ছেলে আছে। কূটনীতিজ্ঞ মনে করেন বাচ্চা থাকলেই হয় দেরিতে আসবে, নয়ত বাচ্চার অসুখের জন্য ছুটি নেবে। আমেরিকায় যেখানে শতকরা পঞ্চাশ জন মহিলা চার বছরের ছোট বাচ্চা রেখে কাজে যায়, সেখানে এই কারণে চাকরি না দেওয়ার জন্য ভদ্রলোককে ফেডারাল লেবার ব্যুরোতে জবাবদিহি করতে হতে পারত। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ভারতীয় ভদ্রলোক এসব কথা একেবারেই চিন্তা করেননি, তিনি তাঁর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করেছেন। এখন প্রচুর ভারতীয় মহিলা আইন, শিক্ষকতা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছেন, হয়ত তাঁদের সঙ্গেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তা জানতে পারি না কারণ তাঁরা অভিযোগ করেন না। মামলা তো করেনই না। এর বাইরে যে সূক্ষ্ম বৈষম্য আমরা গড়ে তুলছি তার ফল কিন্তু আরো মারাত্মক। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বাড়ির মেয়েদের থেকে ছেলেদেরই বেশি প্রাধান্য দিই। মেয়েদের গড়েই তোলা হয় গৃহিণী আর মা হওয়ার উপযুক্ত করে এবং আরো এমন বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে বিয়ের বাজারে তাদের দাম বাড়ে। তারপর পণের বিনিময়ে বিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পণ মনের মতন না হলে বধূহত্যা। অবিবাহিত মহিলাদেরও নানা অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বিবাহিতদের একই সঙ্গে সংসারের কাজ আর চাকরি সামলাতে হচ্ছে। মহিলারা হয়ত এর মধ্যেই জীবনের আনন্দ পেয়ে থাকেন। আত্মতৃপ্তির বিভিন্ন উপায় আছে, ভারতীয় মহিলারা বোধহয় মনে করেন ত্যাগেই তৃপ্তি।

নিজেকে পরিপূর্ণ প্রকাশ করে, নিজের গুণের বা ক্ষমতার বিকাশে যে আনন্দ, তৃপ্তি দেয় তার মূল্যও অপরিসীম। আমেরিকায় এসব সুযোগ বেশি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ওখানে আত্মতৃপ্ত মহিলার সংখ্যা খুবই কম। ভারতে সুযোগ সুবিধা কম থাকলেও অধিকাংশ মহিলাই সুখী।

এর কারণটা লুকিয়ে আছে দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে। আমেরিকা আজ সর্বক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। নারী-পুরুষের সম-অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, চাকরির সুযোগ এসব বিষয়ে তারা অনেক কথা বললেও শুধু এই নিয়ে জীবনে বাঁচা যায় না। প্রকৃত অর্থে সকলে সম-অধিকার পানও না। বিশেষ করে মহিলাদের ওপর তো পুরুষচালিত খ্রীষ্টান সমাজের নানা বিধি-নিষেধ। তাদের জন্য সংসার করা, সন্তানপালন, স্বামীর সেবা, অতিথি আপ্যায়ন এসবেরই বিধান আছে। এই কারণেই জেরালডিন যখন দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন, তখন স্থানীয় এক শিক্ষয়িত্রী তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি ব্লুবেরি মাফিন (বিশেষ ধরনের পিঠে) বানাতে পারেন?' আর এই কারণেই দেশের প্রথম সারির মহিলা, জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি রেগনের স্ত্রী শ্রীমতী ন্যানসি রেগন একজন শুধুই সুসজ্জিতা নারী যিনি তাঁর বেশিরভাগ অর্থ আর সময় খরচ করেন পোশাক ও সাজসজ্জার পিছনে। সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এসব ওখানে আজও সেই দুশো বা তার বেশি বছরের পুরনোই রয়ে গেছে।

ভারতে আমরা কিন্তু সচেতনভাবেই সংস্কারাচ্ছন্ন। একমাত্র রাজনৈতিক নেতারাই প্রতিটি মানুষের সম-অধিকার আর ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে থাকেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কেউই তা মেনে চলেন না এমনকি সেইসব নেতারাও নয়। রাজনীতিকাররাই তাঁদের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় সবচেয়ে বেশি জাত আর শ্রেণীর বিচার করেন। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের প্রভেদটা এইখানে – আমাদের সংস্কৃতি, সংস্কার সবগুলোই খুব খোলামেলা। এতে এখন আর কেউ বিস্ময় বোধ করেন না বা 'বৈষম্য' নিয়ে মামলাও করেন না। এই কারণে উচ্চাভিলাষীরা



সহজেই এইসব বাধা কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কুসংস্কারগুলোও সকলের জানা অথচ আমেরিকায় এগুলো সবসময়ই ঢেকে চলার চেষ্টা। প্রচলিত কুসংস্কারের বাইরে এসে সাফল্য অর্জনকে সবসময়েই ভারতে মেনে নেওয়া হয়েছে, তবে তা নিয়ে কোনো ঢাকঢোল পেটানো হয়নি। আমেরিকা কিন্তু এই নিয়েই আত্মপ্রচার করতে থাকে।

সমাজ, সংস্কৃতির মতন মানুষের ভাবনা চিন্তারও যথেষ্ট পার্থক্য আছে ভারত ও আমেরিকায়। মহিলাদের পরিস্থিতিরও প্রভেদ আছে। প্রভেদটা শুধু উন্নতিশীল দেশের মহিলা বনাম আধুনিক উন্নত দেশের মহিলার নয়।

কোনো একটা বইয়ে পড়েছিলাম ভারতীয় মহিলাদের তিনভাবে চিহ্নিত করা যায় – (১) 'সমস্যা' হিসাবে, এটা প্রধানত তাদের শিক্ষার অভাব এবং দমন করে রাখাকে বাধা দেওয়ার শক্তি বা সাহসের অভাবে। (২) 'সনাতন নারী' হিসাবে, যারা প্রাচীন, প্রথাগত সংস্কার, ঐতিহ্য আঁকড়ে রেখেছেন এবং তা সন্তান-সন্ততির মধ্যেও রেখে যেতে চান। (৩) 'অন্য নারী' যাদের কাজই হল রান্না, বাড়িঘর সামলানো, সন্তানধারণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। এই তিন বিষয় নিয়ে আলোচনা আগে দেখে নিই আমেরিকান দের কিভাবে চিহ্নিত করা যায়।

মত তারা কোনোভাবেই 'সমস্যা' নয় কা.. ণ শিক্ষার ব্যাপারে মহিলাদের সংগে প্রায় কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ নারী পুরুষের সমান। এই কারণেই নারী আন্দোলনের সূত্রপাত। একই শিক্ষা পেয়েও এক কাজের সুযোগ না পাওয়ার বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, বিশেষ করে ভারতের সংগে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে আমেরিকান মহিলাদের উপস্থিতি চিকিৎসা, আইনব্যবসা বা এই ধরনের পেশায় অনেক কম। এই অবস্থার অবশ্য দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যেখানে গত দু-এক দশক আগেও আইনে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩-৪% আজ তা বেড়ে হয়েছে ৩০-৪০%। এই পরিবর্তন নিশ্চয় খুব সহজে আসেনি। এর জন্য মহিলারা অনেক সংগ্রাম করেছেন, এই সংগ্রাম তাঁরা আজও চালিয়ে যাচ্ছেন একই কাজের জন্য এক পারিশ্রমিকের দাবিতে।

একটু লক্ষ্য করলেই এর কারণটা বোঝা যাবে। প্রাথমিক স্তরে মেয়েরা ছেলেদের



সত্তরে পা দিয়েও ওদেশে নিঃসংগতা কাটাতে কেউ কেউ বিয়ে করেন

সংগে পড়াশুনা করে একই পরীক্ষায় পাশ করলেও তাদের কিন্তু একই চোখে দেখা হয় না। বিজ্ঞাপন আর বাণিজ্যিক জগতের দৌলতে মেয়েদের যৌন প্রতীক হিসাবেই গণ্য করা হয়। কমপিউটার থেকে চামচ পর্যন্ত মহিলাদের লাস্যময়ী ভঙ্গি ছাড়া বিজ্ঞাপিত হয় না। এটা যে ভারতে হয় না তা নয়। তবে ভারতে মহিলাদের করে তোলা হয় ভাগ্যের প্রতীক বা পবিত্রতা, শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি। আমেরিকায় মহিলাদের দেহ-সর্বস্ব করে তোলাটাই রীতি।

মেয়েরা তাদের দেহকে সাজিয়ে তুলবে, এটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু কেউ দেখতে খারাপ বা সাধারণ হলে তার ব্যক্তিসত্তাকেও ওই রকমই ধরে নেওয়া হয়। এটাই দুঃখজনক। মেয়েরা অবসাদগ্রস্ত হলে তাদের নতুন ধরনের কায়দা: চুল কাটতে বলা হয়, বা কোনো বিউটি পারলারে গিয়ে রূপচর্চা করতে বলা হয়, এতে নাকি সে 'নতুন মানুষে' পরিণত হয়, উদ্যম ফিরে আসে। ওখানকার বাজারে রূপচর্চার যত রকম সামগ্রী পাওয়া যায় তা দেখেই বোঝা যায় কি পরিমাণ সময় আর অর্থ ব্যয় করা হয় ওর পিছনে। যে কোনো মহিলা পত্রিকা খুললেই দেখা যাবে শুধু প্রসাধনের বিজ্ঞাপন, কিভাবে চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁটকে সাজিয়ে তুলে সুন্দর হওয়া যায়। ভারতে প্রসাধনের চল নেই, তা নয়। তবে অল্প কিছু সংখ্যক মহিলাকে বাদ দিলে দেখা যাবে প্রসাধন বা

দৈহিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব কম, বিশেষ করে প্রতিভা বিকাশে বা কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত হতে তার কোনো ভূমিকা নেই।

শিক্ষিতা এবং প্রগতিশীল হয়েও কিন্তু আমেরিকান মহিলারা একদিকে 'সমস্যা' রয়ে গেছেন। তাঁদের এমনভাবে মগজ ধোলাই করা হয়েছে যে তাঁরা ধরেই নিয়েছেন দৈহিক সৌন্দর্যই তাঁদের সবচেয়ে বড় গুণ, কোনোরকম বুদ্ধির প্রয়োজন তাঁদের নেই, চিন্তা-ভাবনারও দরকার নেই। এটা অবশ্য ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ওখানকার নারী আন্দোলন এই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করছে যাতে মহিলাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগে এবং নিজের প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

আমেরিকার মহিলারা কি ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন? প্রথমে হয়ত মনে হতে পারে কোন্ ঐতিহ্য? আমেরিকার ঐতিহ্য বলতে মনে আসে পশ্চিমী যুদ্ধজয়, আমেরিকার ভারতীয়দের সংগে যুদ্ধ, কলকারখানা আর অজস্র সুখ সামগ্রী। এর সংগে আছে আত্মসুখ, আত্মপ্রচার আত্মগরিমায় উজ্জ্বল এক জাতি। আমেরিকায় যে দুটো কথা সর্বাধিক শোনা যায় তা হল 'স্বাধীনতা' আর 'গণতন্ত্র'। কিন্তু ওখানকার মহিলারা কি তা প্রমাণ করেন? আমেরিকান মহিলাদের যা খুশি পোশাক পরার অধিকার খাতায়-কলমে আছে, কিন্তু বাস্তবে কেউ নিয়মের বাইরে

[এরপর ৪০ পাতায়]

নন্দিতা সেন

সারা ভারতময় ছড়ানো ১৭টা প্রাসাদ-প্রমাণ বিলাসবহুল হোটেল, ৪৪ রকম ব্র্যান্ডের সিগারেট, ৫টা সিগারেট তৈরির কারখানা, সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়ানো ২৩টা বিপণন কেন্দ্র, বিশ্বজোড়া আমদানি-রপ্তানির নেটওয়ার্ক তামাক, সমুদ্রজাত পণ্য, কম্পিউটার সেন্টার ইত্যাদি, ফিরিস্তি দিতে গেলে আরও বিরাট হয়ে যাবে – যার বার্ষিক লেনদেন প্রায় ৪৫০-৫০০ কোটি টাকা, সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির 'ট্যাক্সের' মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত এক বাঙালি মহিলা – তাঁর নাম শ্রীমতী নন্দিতা সেন। বড় এগ্‌জিকিউটিভ, তাই দায়িত্বও অনেক। আমরা অনেকে সময়ের গুরুত্ব দিই না, কিন্তু শ্রীমতী নন্দিতা সেনের মত ভদ্রমহিলারা সময়কে তার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন, তাঁর সেই অমূল্য সময় থেকে কিছুটা ধার করে এই সাক্ষাৎকার। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চললেও শ্রীমতী সেন কিন্তু বাকপটীয়সী, তাঁর কথার মধ্যে আছে আকাডেমিক ছোঁয়া লাগানো ঝিলিক, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব আর মিষ্টি ব্যবহার। পেশায় আইনের স্নাতক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট (ফেলো) আর সর্বোপরি হার্ভার্ডের স্নাতকোত্তর ম্যানেজ-মেন্টের অভিজ্ঞতা।

বাবা বিমলেন্দু গুপ্ত ছিলেন বিলেতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, বিহারের সবচেয়ে পুরনো ফার্ম ওঁদের। শ্রীমতী সেন ১৯৫৮ সালে আইনের স্নাতক হন মেডেল নিয়ে, বাবার অফিসেই তিনি আর্টিকেলশিপে ঢোকেন। ১৯৬২ সালে চার্টার্ড অ্যাকাউ-ন্টেন্ট হন। অবশ্য সি এ হবার আগেই তাঁর গোত্রান্তর হয়। ১৯৬৪ সালে বাবা মারা যাবার পর তিনি ওই ফার্মের কর্ণধার হন। তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা দেখে ক্লায়েন্টদের সংখ্যা তো কমেইনি বরং বেড়ে যায়। যদিও ষাটের দশকে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল একটি মেয়ে পারবেন কিনা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সীর ব্যবসা চালাতে, কিন্তু নন্দিতা সেন দেখিয়ে দেন, পারা যায়। অবিশ্বাসকে হেলায় হারিয়ে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন – তিন-চার বছরের মধ্যে ফার্মের অগ্রগতি হয়েছে তিন গুণ। বিহারে তখন তিনি শুধু বাঙালি মেয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নন, একমাত্র মহিলা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। স্বামী কলকাতায়, উনি পাটনাতে – অসুবিধে হত খুব। ১৯৭২-এ কলকাতায় চলে এলেন, যোগ দিলেন ইন্ডাস্ট্রিতে। তারপর নন্দিতা সেন আর পিছনে ফিরে তাকাননি। শুধু কাজ, পড়াশুনো, মিটিং, বিদেশ ভ্রমণ – এগিয়ে গেছেন সাফল্যের রাস্তা ধরে – সাফল্য এবং সার্থকতার চূড়াতে।

শ্রীমতী সেনকে তাঁর প্রফেশনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা প্রশ্ন করি, এবং স্বভাবতই তাঁকে জিগ্যেস করেছি এই প্রফেশনে এখন বাঙালি মেয়েদের উপস্থিতি কেমন, ভাল এগ্‌জিকিউটিভ হতে গেলে কি



গুণ থাকা দরকার, তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

প্রঃ হার্ভার্ডে আপনার কর্তাদিনের কোর্স ছিল, কারা পাঠিয়েছিলেন, ওখানকার পরিবেশ কেমন, ক'জন মেয়ে ছিলেন, ওখান থেকে আপনি যা শিখে এসেছেন তার ব্যবহারিক দিক এদেশের পটভূমিকায় অন্তরায় হয়েছে কি না?

উঃ ১৯৮২-তে আমি হার্ভার্ডে যাই অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে। আমার কোম্পানি আমাকে স্পনসর করে। তেরো সপ্তাহের এই কোর্সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫২ জন ছাত্র এসেছিলেন। মহিলা বলতে আমি ও আরেকজন আমেরিকান। ওখানে আমার সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে। পরিবেশ যেমন পড়াশুনোর জন্য অনুকূল তেমনি শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নজর। সময় সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অপূর্ব। হার্ভার্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ভারী সুন্দর। ওখানে স্যাম হেয়েজ, জো বাওয়ার – এরকম সব পৃথিবী বিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছ থেকে ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বিষয়ে পড়াবার সুযোগ পেয়েছি। ওখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ম্যানেজমেন্ট ও অর্থনীতির 'সিস্টেম' 'কেস স্টাডি'-ভিত্তিক প্রথায় দেখতে ও জানতে হয়েছে। দেখেছি বর্তমানে একটা সিস্টেম বা পদ্ধতি কোনো অর্থনীতির পক্ষে সুন্দর লাগলেও কিভাবে তা ভবিষ্যতের নিরিখে কত খারাপ হতে পারে। তৃতীয় বিশ্ব, পেট্রোডলার, নিউগাল্ফ অর্থনীতি সবই পড়েছি, জেনেছি কেস স্টাডি অনুসারে। কেস স্টাডি তৈরি করা হয় বিভিন্ন সংগঠনের তত্ত্ব এবং তথ্যের ভিত্তিতে।

প্রঃ আচ্ছা, আমেরিকাতে যা শিখেছেন সেটা তো মূলত ধনতান্ত্রিক কাঠামো, ব্যবহারিক ভিত্তিতে তা কতটুকু কাজে লাগবে?

উঃ আমরা যা জেনেছি সেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নয়, ম্যানেজমেন্টের স্টাইল। এটা কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ওপর নির্ধারিত হয় না, এটা সর্বজনীন। আমরা শিখেছি 'ক্রস ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ', শুধু মার্কেটিং, ফিনান্স, প্রোডাকশন নয়, কিভাবে একটা সমস্যার সঙ্গে আরেকটা সমস্যা জড়িয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করা এবং সমাধান করা। সমস্যার 'থ্রেড বিয়ার' অ্যানালিসিস করতে ওখানে শেখানো হয়েছে।

ওখানে প্রত্যেকটা 'কেস স্টাডি' লেখা থাকত প্রায় ৪০-৫০ পৃষ্ঠা ধরে। আর প্রত্যেকদিন তিনটে করে এইরকম 'কেস' নিয়ে আলোচনা হত। তেরো সপ্তাহে আমরা তেরো ভল্যুম কেস পড়েছি রেফারেন্স বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বুঝে দেখুন, কিভাবে আমাদের খাটতে হত। রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত পড়াশুনো করতাম। পরের দিন সকালে আবার ক্লাস, আবার আলোচনা, আবার নতুন কেস। এবং তাও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর।

কোর্সের দ্বিতীয় ভাগে 'ক্রস ফাংশনাল' এরিয়াতে কাজ করেছিলাম আমরা। যার উদ্দেশ্য হল একটি সংস্থার সর্বোচ্চ পদে থাকলে যে ধরনের মানসিক 'অ্যাপ্রোচ'-এর দরকার সেভাবে ম্যানেজমেন্ট 'অ্যাপ্রোচ' তৈরি করা, যেখানে ডিসিসন ফিনান্স বা মার্কেটিং এরকম কোনো ডিসিপ্লিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

(এই বলে শ্রীমতী নন্দিতা সেন আমাকে তাঁর হার্ভার্ডের কেস স্টাডির ভল্যুম দেখাতে নিয়ে গেলেন তাঁর লাইব্রেরিতে। বাইরে লোডশেডিং। ইনভার্টারের আলোয় দেখলাম দুটো র‍্যাকে ভর্তি তাঁর কেস স্টাডি, যার একেকটার সাইজ প্রমাণ সাইজের এনসাইক্লোপিডিয়ার মত। স্বল্প আলোতেও শ্রীমতী সেনের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জ্বলছে দেখলাম।)

প্রঃ আচ্ছা, বর্তমানে বাঙালি মেয়েরা সি এ

হচ্ছেন না কেন?

উঃ কে বলল? প্রত্যেক বছরই তো মেয়েরা সি এ হচ্ছেন। আর কোনো প্রফেশনে মেয়ে ও ছেলে বললে, আমার মনে হয় এতে মেয়েদের ছোট করে দেখা হবে। এখানে মূল সমস্যা হচ্ছে সি এ একটা প্রফেশনাল পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারিতে নিয়মিত পড়াশুনো হয়, একটা পড়াশুনোর আবহাওয়া থাকে, কিন্তু এখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবহাওয়া পাওয়া যায় না। অফিসের কাজের (আর্টিকেলশিপ) পরে বেশি পড়তে হয়, বেশি খাটতে হয়। অনেকের ধারণা, পরীক্ষার দু'তিন মাস আগে-পরে মেরে দেবো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এটা একটা কঠিন সর্বভারতীয় পরীক্ষা। এখানে প্রচুর খাটতে হয়, সে পরিশ্রমের মধ্যে যেন খাদ না থাকে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো সি এ ইনস্টিটিউটের কলকাতার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখেছি বাঙালি ছেলেমেয়েরা প্রায়ই যান না, কিন্তু অবাঙালিরা কেমন সুন্দরভাবে পড়ছেন। তাঁরা ফলও ভাল করেন। লাইব্রেরি ওয়ার্কসেরও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, প্রফেশনকে ভালবাসা সবই চাই।

প্রঃ আচ্ছা, কোম্পানি ট্যাক্স করতে গিয়ে আপনি মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল থাকেন কি?

উঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে একটু টেনসড্ থাকি বা থাকতাম। কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। কারণ বাজেটের থেকে বিশেষ কিছু আশা করা ছেড়ে দিয়েছি। 'ডায়নামিক চেঞ্জেস' বড় একটা হয় না।

প্রঃ ভারতের মুদ্রাস্ফীতির কারণ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ 'ইনফ্লেশন'-এর একমাত্র উত্তর উৎপাদন বাড়ানো। শুধু 'প্রোডাকশন' নয় 'প্রোডাক-টিভিটি'। সব জিনিসের উৎপাদন বাড়াতেই হবে। নাহলে 'ইনফ্লেশন' রোখা যাবে না। সরকার নীতি নিয়েছেন 'সোস্যাল জাস্টিস' আনার, কিন্তু সেই একই নীতিতে যে 'ইকনমিক ডেভিলপমেন্ট'ও আনতে হবে, 'প্রোডাকটিভিটি' বাড়াতে সাহায্য করতে হবে – তার সচেতনতা কোথায়?

প্রঃ আপনার কি মনে হয়, মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মা-বোনেরা যেভাবে সংসার চালান – যদি সেটাকে ক্ষুদ্রতম 'ইউনিট' ভাবা যায়, তার সঙ্গে আপনাদের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স শীট, ট্যাক্স ইত্যাদি ব্যাপারের কোনো তুলনামূলক রেখা টানা যেতে পারে কি?

হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন নন্দিতা সেনঃ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মেয়েরা সংসার চালান তা থেকে তাঁরা চার্টার্ড অ্যাকাউ-ন্টেন্টকেও শেখাতে পারেন। 'লিমিটেড' আয়ের মধ্যে তাঁরা সংসার চালাচ্ছেন, ধার করছেন না, আবার জমাচ্ছেনও। (আর আমাদের বিরাট কোম্পানিগুলির দু'ভাগ ধার, এক ভাগ নিজেদের টাকা।) ওঁরা প্রফেশনালী সি এ না হয়েও অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন না কি?

তিনপুরুষের ঐতিহ্য ধরে একমাত্র ছেলে ভাবী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের মা শ্রীমতী নন্দিতা সেন (স্বামীও চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট ও চার্টার্ড সেক্রেটারি) বললেন, আমাদের দুটো সত্তা অফিস আর বাড়ি। অফিসে গেলে বাড়ির কথা ভুলে যাই। সেখানে আমার কোমপানির ট্যাক্স, ফিন্যান্স, এক্সপ্যানশন, কম্পিটিশন, কোটি কোটি টাকার হিসেব-নিকেশ, সময় কেটে যায় ভীষণ দ্রুত, সেখানে ভুলে যাই – আমি মেয়ে, আমি মা। কিন্তু যখন বাড়িতে আসি তখন আমি পুরোপুরি মা, আমি স্ত্রী। দুটোকে এক করিনা, করলে হয়তো কোনক্ষেত্রেই সুফল হয় না। তাই বাড়িতে আমি গৃহকর্ত্রী, ছোট্ট একটা পরিবারের। সেখানে আমি বাঙালী গৃহবধূ।

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বলহীনা প্রাচীনা

চিত্রা মৈত্র

জীবনের অনিবার্য পরিণতি বার্ধক্য। সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়কেই এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বীকার করে নিতে হয়। নারীদের ক্ষেত্রে বোধহয় জীবনের এই শেষ পর্ব অধিকতর বেদনাময়। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে রয়েছে সেই সম্বলহীনা প্রাচীনাদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ওপর এক আন্তরিক পর্যালোচনা।

সেই যে বিষণ্ণ রাজকুমার জরা মৃত্যুর কবল থেকে মানবজাতির নির্বাণের পথ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তারপর দ্বিসহস্রাধিক বছর কেটে গেল। মৃত্যুকে যদি বা পেছিয়ে দেওয়া গেল, জরা কিন্তু তার করালগ্রাস থেকে রেহাই দিল না কাউকেই। যা অবশ্যম্ভাবী তাকে না মেনে নিয়ে উপায় নেই।

গত কয়েক দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতি মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়িয়েছে কি পরিমাণ-তার একটা জনগণনা ভিত্তিক (Demographic) বিশ্লেষণ দিয়ে সূচনা করা যাক ১৯২১ সালে একজন সাধারণ ভারতীয়ের আয়ুষ্কাল ছিল গড়পড়তা ২৬ বছর ১১ মাস, ১৯৫১ সালের আদমশুমার অনুসারে ৩০ বছর থেকে ৩২ বছর ৫ মাস, ১৯৬১ সালে প্রায় ৪৫ বছর, আর ১৯৭১ সালে ৫২ বছর ৬ মাস। জন্মের পর থেকে মৃত্যুর মুহূর্তটি পর্যন্ত সময়সীমার গড় বিস্তৃতি যে আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জরাকে কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে মানুষ? বয়সের ভারে জীর্ণ অগণিত নরনারী শুধু প্রাণধারণের আর দিনযাপনের গ্লানি বয়ে চলতে থাকবেন। এঁদের প্রতি সমাজের কি কোনো কর্তব্য নেই?

যদিও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এদেশে পক্বকেশী সম্বলহীনাদের সামাজিক পুনর্বাসন সম্পর্কে একটি আলোচনা, তবু সময় যেহেতু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপরই তার নির্মম হস্তাবলেপন করে থাকে, তাই প্রাসঙ্গিক হবে মনে করেই আরও একটু পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। পঞ্চান্ন বছর বয়স পেরুলেই (কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরেদের ক্ষেত্রে আটান্ন) এদেশে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। অবসরপ্রাপ্ত এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে এখন বেড়ে চলেছে প্রতিদিন প্রায় ৭৫০ জন করে, গড়ে বছরে সমগ্র জনসংখ্যা শতকরা ১ ভাগের কিছু কম। ১৯৫১ সালের জনগণনায় যা ছিল ৩০ কোটির কিছু কম, ১৯৬১ সালের আদমশুমার-এ তা দাঁড়ায় গড়ে ৩২ কোটিরও কিছু বেশি। এই সংখ্যা যে ইতিমধ্যে আরও স্ফীত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এখন সমস্যার চেহারাটা অন্যরকম হতে বাধ্য। শুধু বেঁচে থাকতে আনন্দ কোথায়। বাঁচার মত বাঁচার দিন কি এঁদের ফুরিয়ে গেছে? বয়স্ক পুরুষ অবশ্য কর্ম থেকে অব্যাহতির পর দূরদর্শন, রেডিওর কল্যাণে খানিকটা শ্রান্তি লাঘব করতে পারেন, তাস খেলে, বৈকালিক ভ্রমণ এবং নিজের নিজের হবি বা খেয়াল নিয়ে দিনযাপনের গ্লানি কথঞ্চিৎ ভুলে থাকতে পারেন, কিন্তু বয়স্কা একজন মহিলার দিনাতিপাত অত সরল হতে পারে না এদেশে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি নমুনা সমীক্ষা চালিয়ে দিল্লির একজন মহিলা সমাজ বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন, প্রাচীনাদের মধ্যে শতকরা ৯৪ জন তাঁদের সংসারের নানান টুকিটাকি কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এই পরিসংখ্যানে তাঁদেরও ধরা হয়েছে, যাঁরা বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে পড়েননি এবং এখনও সংসারের কর্ত্রীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। সর্বক্ষণের জন্যই ঘরকন্নার দায় সামলান তাঁরা, অবসরের সময়টুকু টুকিটাকি হাতের কাজ নিয়েই থাকতে চান। এককথায় 'বিশ্রাম' এঁদের অভ্যাসবহির্ভূত। শতকরা ১৫ জন ঘরের বাচ্চাকাচ্চার ঝক্কি পোয়াবার দায় গ্রহণ করেন স্বেচ্ছায়। শতকরা ৫৬ জন নিয়মিত দেবালয়ে যান, পূজাপার্বণে ব্যাপৃত থাকতে ভালবাসেন। শতকরা ৪২ জন স্বজনবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, গল্পগুজব করে সময় কাটান, শতকরা ১২ জন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, শতকরা ৬ জন উপন্যাস ছোটগল্পের অনুরাগী পাঠিকা, শতকরা ৩১ জন প্রাচীনা কার্যত অকর্মণ্য।



ফটো : পাহাড়ী রায় চৌধুরী

এদেশে একটি আদর্শ হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারে বৃদ্ধ এবং অশক্তেরা আশ্রয়ের অভাব অনুভব করেন না। যেসব সৌভাগ্যবতী পাকাচুলে সিঁদুর পরেন, কিংবা বৈধব্য যাঁদের ক্ষেত্রে দেরিতে এসেছে, তাঁদের আজন্ম লালিত সংস্কার এবং মূল্যবোধই বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। হালকা সাংসারিক কাজকর্ম, পরিজনদের শুশ্রূষা, সহানুভূতি, সমবেদনা তাঁদের অকর্মণ্যতার দায় থেকে রেহাই দেয়। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে পুত্রবধূস্থানীয়াদের সঙ্গে একটা চাপা বিরোধ চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটায়। কিন্তু এহ বাহ্য। সংসারে সকলেই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। কোনো কোনো অতৃপ্তিও স্বর্গীয়, যাকে বলে Divine discontentment সমস্যা এঁদের নিয়ে নয়। এঁদের জন্য সরকারি সাহায্য বা খয়রাতির প্রয়োজন হয় কদাচিৎ। সমস্যা হল তাঁদের নিয়ে, যাঁরা ঘটনাচক্রে নিঃসহায়, নিঃসম্বল হয়ে পড়েছেন। এবং এঁদের সংখ্যাটা জনস্ফীতির সাধারণ নিয়মে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। মন্দিরে, দেবালয় চত্বরে তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের ডিশ হাতে যেসব বৃদ্ধা ভক্তসজ্জনের দয়া ভিক্ষা করেন, তাঁদের অনেকেরই অতীত অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, একটা সম্ভাবনাময় যৌবন, স্বপ্নঘেরা সংসারের অধিকার তাঁদেরও ছিল। সমাজ এবং পরিজনের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত একটা অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শিকার এই অবহেলিত বৃদ্ধারা আজ আক্ষরিক অর্থেই outcast বা সমাজ-পরিত্যক্ত।

আধুনিককালে সামাজিক নিরাপত্তার যে-দুটি ব্যবস্থা এদেশে বর্তমান, তার মধ্যে একটি হল সামাজিক বীমা, যে-ব্যক্তি তার শারীরিক সক্ষমতার সময়ে উপার্জনের সুযোগ পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় করেছেন, তাঁকে অন্তত আর্থিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত করতে পারে সামাজিক বীমা ব্যবস্থা। এখনও এদেশে এ-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। গত তিন দশকের অর্থনৈতিক চাপে যেসব মহিলা জীবিকার দায়ে বাইরে বেরিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁদের অজস্র পুরুষ সহকর্মীর মতই জীবিকা থেকে অবসর নেবেন, তাঁরা সামাজিক বীমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অন্য আরও একটি ব্যবস্থা যা আছে তা হল খয়রাতি। এবং এ-ব্যবস্থা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, নেই বললেই চলে।

উত্তর প্রদেশ, কেরালা, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা (old age Pension scheme) নামে একটি ব্যবস্থা সম্প্রতি চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ভিত্তিতে একটি আদর্শ বার্ধক্য ভাতার পরিকল্পনা গ্রহণ করেও পরিত্যাগ করেছেন সরকারি কোষাগারে সম্পদের অপ্রতুলতার অজুহাতে। রাজ্য সরকারগুলিও এই Pension প্রাপকদের উপর যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তার মধ্যে আছে এমন সব প্রতিবন্ধক, যেমন–বয়স, প্রয়োজনের তাগিদ নির্ধারণ, আত্মীয়স্বজন আছে কিনা, স্থায়ী বাসস্থান, কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী আশ্রয়, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পান কিনা–এমনি অজস্র বায়নাক্কা। কোনো কোনো রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার জন্য কিছু বরাদ্দ আছে, যেমন–চিকিৎসা ব্যয় বা মৃতের সৎকার ইত্যাদি। কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রাপকের নিজস্ব আয়ের কোনো সূত্র থাকা চলবে না। খয়রাতির পরিমাণও সবক্ষেত্রে একটা বাঁধা দরে নির্ধারিত, ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন পরিমাপ না করেই, দাক্ষিণ্যের এই খুদকুঁড়োতে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থানও হয় না। আবার এ দাক্ষিণ্য তাঁদের বরাতে জোটেও না, যাঁরা সরকার-নিয়োজিত আমলাদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখেন না। যিনি আক্ষরিক অর্থেই নির্বান্ধব, নিরক্ষর কিংবা স্বল্পশিক্ষিতা, তাঁদের কাছে এই সরকারি খয়রাতির খবরও পৌঁছায় না।

সরকার বা অন্য কোনো গণ সংস্থার প্রচেষ্টায় এ-যাবৎ এদেশে নিঃসহায়, নিঃসম্বল বৃদ্ধাদের জন্য কোনো আশ্রম বা আবাসস্থল গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। এ-যাবৎ কোনো রাজ্য সরকার তাঁদের রাজ্যাধীন দুঃস্থা বয়স্কা মহিলাদের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সেবাশ্রম (Institutional care home) গড়ে তুলবার পরিকল্পনা করেছেন বলেও জানা যায় না। আবার পৌরসংস্থাগুলি এ-ধরনের কোনো আশ্রয় শিবির গড়ে তুলুক অথবা কোনো স্বয়ংসেবী সংগঠন আপনা থেকে গড়ে উঠুক–এ ব্যাপারে কোনো সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন বলেও মনে হয় না। এখন পর্যন্ত পৌরসংস্থাগুলি এবং পঞ্চায়েতগুলি কোনক্রমে সীমিত ক্ষেত্রে ডোল বিতরণ জাতীয় গণদায়িত্ব পালন করে নিশ্চিন্ত। অথচ অন্যান্য দেশে সহায়সম্বলহীনা বয়োবৃদ্ধাদের জন্য তো কত ব্যবস্থাই হয়েছে! বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলি বৃদ্ধ ও অশক্তদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনের অনুকরণীয় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বয়স্ক এবং বয়স্কাদের জন্য, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও, কয়েকটি আবাসস্থল গড়ে উঠেছে।

স্বয়ংসেবী সংগঠন অথবা অন্য কোনো গণ উদ্যমের মারফত এ ধরনের শিবির বা আশ্রম গড়ে উঠলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ডের রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, যাতে করে এ সমস্ত আশ্রম বা শিবিরে সেবাযত্নের একটা ন্যূনতম মান রক্ষিত হয় এবং সরকার সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অবশ্য বয়োবৃদ্ধাদের বসবাসের জন্য পৃথক ফ্ল্যাটও নির্মিত হয়েছে। কোথাও কোথাও এ সমস্ত ফ্ল্যাটে সে সমস্ত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বসবাস করেন। তাঁরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজেদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সামলে নিতে পারেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখা–যাতে বয়স্করা স্বাধীনভাবে যত দিন পারেন বসবাস করুন। নিঃসঙ্গতা তাঁদের যেন পীড়িত না করে। সাধারণ গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করে এদেশেও এ-ধরনের ছোট ছোট ফ্ল্যাট তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে সক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাস করতে পারবেন। যাতে কখনই তাঁরা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভেবে বেদনা বোধ করবেন না। আবার সক্ষম যাঁরা, তাঁরা সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজকে কিছু দিতেও পারবেন।

কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের জরাগ্রস্ত, সমাজকে যাঁদের আর নতুন করে কিছুই দেবার নেই, দেহযন্ত্রের প্রধান অংশগুলি আর যাঁদের কাজ করছে না, যাঁরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে অসমর্থ, আলংকারিকভাবে আমরা যাঁদের বলি দ্বিতীয় শৈশবে উত্তীর্ণ সেইসব বৃদ্ধ শিশু সমাজের কাছে দাবি করতে পারেন এমন যত্ন বা সেবা, যা সদ্যোজাত সন্তান পেয়ে থাকে তার মায়ের কাছে। মাদার টেরিজার একক প্রচেষ্টায় কিছু হওয়া সম্ভব নয়, আবার দু-একটি ধর্মীয় সংগঠন যা করছে, তাও যথেষ্ট নয়। অশক্ত এই মানুষেরা যাঁরা আমাদেরই সমাজভুক্ত পিতৃ কিংবা মাতৃস্থানীয়া, তাঁরা মিটিং মিছিলের মাধ্যমে, বিধানসভায় অভিযান করে দাবি জানাবেন এমন আশা করাও বাতুলতা। তাই এঁদের জন্য সরকারের কর্ণধারদের উদ্যোগী হতে হবে। স্বেচ্ছায় সহৃদয়তার সঙ্গেই তাঁরা এগিয়ে আসবেন।

নিজের ধাঁধা

মানসী দাশগুপ্ত



আজ সকালেও পড়ছে বৃষ্টি। দিনের সঙ্গে রাতকে যুক্ত করে। গাড়ির জানলার কাচে মুখ রাখলেই কাল সারারাতের ধুলো-ধুয়ে-দুধ-পরিষ্কার স্বচ্ছ ফোঁটা তার গালে লেগে যাবে, জুড়িয়ে যাবে গাল মুখ বুক।

কাল একটা গরম পড়েছিল বটে। অসম্ভব গরম। বেলা দশটায় হোটেল ঘরের বিছানায় ডুবে যেতে যেতে শমিতা ভেবেছিলঃ বেরিয়ে এখন খোঁজে যেতে হবে, হবেই! ভাবতে গেলেই নিজের পক্ষে 'হার্ডশিপ ক্লজ' ব্যবহারের প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায় শমিতার, প্রভুর পরিহাসচ্ছলে বলে-ওঠা সেই কথা, সেই দিন। তখন রনিকে নিয়ে একটু কানাকানির দিন। অভ্যাসমত খাওয়া সেরে উঠে "আজকের স্টোরিটা দপ্তরে দিয়ে আসবে তো চলো তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই" না বলে কেমন একটু আড়ে-ঠারে তার দিকে বার দুই দৃষ্টি ফেলে প্রভু বলেছিল, "যাবে না দপ্তরে? তোমায় তৈরি দেখছি না যে?"

প্রভঞ্জনের নতুন পদোন্নতি, নতুন গাড়ির নতুন গরম। সে সব কিছু অবশ্য বলত না শমিতা, সেদিনও বলেনি। শুধু বলেছিল, "আজ আর না গেলাম। স্টোরিটা তেমন তৈরিও –।"

ব্যস, বাকিটা বলতে না দিয়েই প্রভু যেন হাসির চোটে লাফিয়ে উঠেছিল, "গরম, না? বিদেশী বউ হলে তুমি 'হার্ডশিপ ক্লজে'ই এ দেশ থেকে পালিয়ে যাবার যুক্তি পেয়ে যেতে। হায় শমিতা, এটুকু বাধায় গেছে ঠেকি?"

"কী কথায় কী কথা। আমি বলছিলাম –।"

"তুমি বলছিলে তৈরি নয় তোমার 'স্টোরি', 'কুকিং' যাকে বলে। এই তো। রেধে তোল ভালো করে, উইশ ইউ অল লাক। অবশ্য আমার 'উইশ' ছাড়াও তোমার চলছে ভালো।"

গেরুয়া রঙ ট্র্যাভেলিং অ্যালার্ম ঘড়িকে কানের পাশে রেখে অসময়ের ঘুম ঘুমিয়ে পড়ার আগে শমিতা না ভেবে পারেনি, ঘরটা তাদের ভাঙতই। রনি-টনি কিছু নয়, অজুহাত মাত্র। আসলে ঘর হয়ত তাদের তৈরিই হয়নি।

ঘুম ভাঙলে শমিতার বুঝে নিতে একটু সময় লাগে ঠিক কোথায় ভাঙল এ ঘুম। কতদিন হল বড় বেশি ঘোরাফেরা চলছে তার। বড় ঘন ঘন। এই সপ্তাহে কলকাতায় তো সপ্তাহান্তে ব্যাঙ্গালোরে। পরের সপ্তাহেই হাজিরা দিতে হবে বম্বেতে। চলছে এমনিই। ছুটে ছুটে অথচ কাউকে ধরতে না দিয়ে, যেন ধীরে সুস্থে এলাম এমনি

করে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাওয়া কোনো একজনকে বুঝে ওঠার জন্য, কখনো বা কোনো একটা বিষয়ের সমস্ত সুতো গুটিয়ে তোলার জন্য। এভাবেই তো সত্যিকারের খবর তৈরি হওয়ার ব্যাপারটাকে শমিতা দেখতে চেয়েছে, দেখাতে চেয়েছে, তার মনের মতন কাজই তো এটা। আগের সেই শীতলবাবুর কাজ পালটে আসা থেকে এখন পর্যন্ত এ সমস্ত তার বেশ নিজস্ব ছাঁদমত চলেছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই ছন্দ বড্ড দ্রুত হয়ে যায় থেকে-থেকে। ঘুম ভাঙার পরে তাই কয়েক সেকেন্ড ঠাহর করে নিতে হয় সে ঠিক কোথায়, কোন ঘরে রয়েছে। কেউ কি সঙ্গে রয়েছে তার? না কি একা সে নিজের নির্জনতায় নিরাপদ? এই যে ফোনটা বাজছে এই ফোনের ও প্রান্তে যে গলা শোনা যাবে সে কি কোনো সহৃদয় মানুষের? কোনো আত্মীয়ের? কোনো কটুভাষী কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর? আদুল শরীরে ঢিলে সর্বাঙ্গবাসটি জড়িয়ে কোমরের শৌখিন পট্টিতে গিঁটি দিতে দিতে এত কথা সবই এলোমেলো মনে ভেসে গেল তার। "হ্যালো।"

হোটেল কাউন্টারের সঙ্গে ওপাশে মানুষটির কথা ফুরোয়নি, 'হ্যালো, নিউ কেনিলওয়ার্থ?' 'য়্যু ওয়ান্টেড শমিতা চৌধুরী?' 'ইয়েস্।' 'স্পীক হিয়ার, প্লীজ!' "হ্যালো।"

"হ্যালো।" আবারও বলতে হল শমিতাকে।

"শমিতা, বল আমি কে বলছি?"

শমিতা ফোনে ক্ষীণ হাসল। যদি বলতে পারেও শমিতা, তাতে কার কী মস্ত লাভ হবে হে যোগাযোগকারী ভদ্রলোক? কেন তুমি একই ঢঙে খেলা খেল বারবার, বারবার?

"হ্যাঁ, অন্যের রহস্যজাল মোচন করে বেড়াও, নিজের মানুষকে চিনতে পার না?"

শমিতা সহজ হবার চেষ্টা করল, "নিজের মানুষ কেউ কি আছে?"

"ওসব দার্শনিকতায় লুকিয়ে রেখে চলবে না।"

"রেখে নয়, গেলে, 'লুকিয়ে গেলে চলবে না' কোটেশন এখনো একই রকম ভুল চালাচ্ছ প্রভঞ্জন?"

"তুমিও একই রকম মাস্টারি চালাচ্ছ তো দিদিমণি।" প্রভঞ্জন ফোনের ওপারে রব তুলে হাসল। হাসল শমিতাও। যদিও সে যে সেই মুহূর্তে খুব স্বস্তিতে ছিল এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। চমৎকার ঠান্ডা ঘর, পর্দা টানা অন্ধকার, ঘুমে যতক্ষণই কেটেছে মনে হোক আসলে সামান্য আগেই সে যে শৌখীন সাবানে ফেনা-ফেনা করে চমৎকার স্নানটি সেরেছিল, সংলগ্ন স্নানঘরের দরজা ফাঁক হয়ে থাকায় তার গন্ধটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘরের ভিতরের হাওয়াকে মিষ্টি করে দিয়েছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা অমসৃণ প্রশ্ন শমিতার ঠোঁটে চুলকে যাচ্ছেঃ কী হল, হঠাৎ ফোন কেন?

অথচ প্রশ্নটা করা যায় না। তিন বছর আগে, যখন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়নি তখন এ রকম খোলাখুলি রূঢ় কথা বললেও বলতে পারত তারা পরস্পর, কিন্তু তারপর থেকে, না, না, তার কোনো প্রশ্নই নেই। এ সব এড়াবার জন্যই তো ছাড়াছাড়ি। কথাটা শমিতা মনে রাখে। সেবারে প্রভঞ্জন দুম করে যা করেছিল তাতে অবশ্য মনে হয়নি যে প্রভু, মানে, প্রভঞ্জন এসব খেয়াল করে চলে। যাই হোক, এখন ফোনে সে কী সব বলছে শুনে নেওয়া দরকার।

"কেমন করে জানলাম তুমি শহরে এসেছ আর ঠিক এই হোটেলেই আছ জানতে চাইলে না যে?"

শমিতা এবারে আর কথার খেলায় জিততে দিল না প্রভঞ্জনকে। বলল, "সবই যদি জিগগেস করে নিয়ে তবে জানব তাহলে আর কিসের এজেন্সির কাজ আমার সেটা বল?"

ফোনে কি ধরা যায় কেউ মলিন হয়ে গেল কি না? যায় বোধ হয়। প্রভঞ্জন যখন বলল 'ওয়েল' তখন কেমন ম্লান মনে হল তাকে। তারপরেই অবশ্য সে সহজ স্বরে বলল, "শমি, সারি, শমিতা, একবার দেখা করতে পারি? সময় হবে?" তারপরে জুড়ে দিল, "সেবারের মতো কোনও দৃশ্যের অবতারণা করব না, প্রমিস্!"

খুব চেষ্টা করে দ্বিধা কাটাল শমিতা। "সন্ধের মুখে ঘণ্টাখানেক সময় আছে।"

"ঘণ্টাখানেক! স্বপ্নাতীত!! চলে আসব ঠি –।"

"স্কাই-রুমে।"

উচ্ছ্বাস থেমে গেল প্রভঞ্জনের। "স্কাই-রুমে? কেন?"

"সুবিধে। ছ'টায়, মানে পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক, ঘুরতে ঘুরতে আসব তো?"

"বেশ। স্কাই রুমেই। ছটা। শার্প।"

স্কাই-রুমের এই খাবার দোকানের বয়স নেহাত কম নয় কিন্তু তারুণ্য এখনো পুরোপুরি যায়নি। এখানে যেদিন প্রথম এসেছিল শমিতা, খুব স্মরণীয় দিন সেটা তার জীবনে। না, না, বিয়ে-টিয়ে নয়। বিয়ের সময়ে তখন কী-বা তাদের আয়-উপার্জন, চাইতও না করতে, করতও না, সে সব অন্য কথা। যাই হোক, তখন স্কাই-রুমে বসে ভোজনসুখের কথা তাদের মনেও উদয় হয়নি। ঢের পরে, নিউ ফ্রন্টিয়ার কাগজে যেদিন শমিতার পাকা যোগাযোগ হয়ে গেল সেইদিন শমিতা, হ্যাঁ শমিতা স্বয়ং ফোন করে ডেকে এনেছিল প্রভঞ্জনকে এখানে। নিজের কাজ ছেড়ে প্রভঞ্জন সহজে বেরোতে চায় না কি? নেহাত ওর এশিয়াটিক সোসাইটিতে কী একটা ব্যাপারে দপ্তরের কাজের জন্যেই আসতে হচ্ছিল তাই পেয়ে গিয়েছিল সেদিন শমিতা তার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ও মনোযোগ।

"জন বুলের আমাকে পছন্দ হয়ে গেছে জান?"

প্রভঞ্জন বেশ ঠান্ডা, বুদ্ধিমন্ত গলায় বলেছিল, "ওসব টেঁশো রসিকতা থাক। আসল কী বলল ওরা? ওয়ার্কিং আওয়ার্স নিয়ে? ইন্টারভিউয়ে আরও কাউকে ডেকেছিল না কি?"

গল্পটাকে নিজের মতো করে বলতে দেবে না। ওর মতো করে বলতে হবে। এইটেই প্রভঞ্জনের ধরন। এইটাকেই ও একমাত্র ধরন বলে জানে, কাজেই শীতলবাবুর কাছে কাজে কেন শমিতার মন উঠছিল না এটা প্রভঞ্জন কোনদিনই বুঝতে পারল না। এই স্বাভাবিক। প্রভঞ্জন যদি শীতলবাবুর সঙ্গে কাজ করত সে বোধহয় ধরেই নিত যে শীতলবাবুর কাগজে গল্পটা কী হবে সেটা শীতলবাবুই বলবেন, অন্য যারা আছে তাদের কাজ হচ্ছে মালমশলার যোগানদারি। শমিতা ছিল সেই অন্যদের একজন, তার বেশি কিছু নয়। কী যে সব বলেছিল প্রভঞ্জন! – "বড্ড প্রমিনেন্স্ চায় মেয়েরা সর্বত্র, এইটেই হচ্ছে মুশকিল। এত লোক ওখানে কাজ করছে কারো সঙ্গে শীতলের একটুও বাধছে না তো? তুমি, তোমাকে ও যত নানাভাবে 'আপ' দিচ্ছে, ততই, মানে, কিছুতেই যেন পুরো দাম পাচ্ছ না নিজের।" বলে একটু হেসে কথাগুলো মোলায়েম করে নিতে চেয়েই শমিতাকে সে আঘাত করেছিল সবচেয়ে বেশি। নিজেকে খুব অপমানিত মনে হয়েছিল শমিতার। সে যেন সমগ্র স্ত্রী-সমাজের একক প্রতিনিধি, এইভাবে তার সঙ্গে কথা বলা আর পরক্ষণেই সে যে শুধুমাত্র শমিতাই এ কথাটা চোখভরা চাহনিতে ফুটিয়ে তুলে মিষ্টি করে হাসা, এই দুইয়ের ভিতরে কিছু একটা বিরোধ সে দেখতে পেয়েছিল যা উচ্চারণ করে বুঝিয়ে বলা শক্ত কিন্তু ভিতরে ভিতরে যা তাকে উত্যক্ত করে।

তবু, নিউ ফ্রন্টিয়ারে যাবার পূর্বলগ্নে

এখানে সে প্রভঞ্জনকেই ডেকেছিল। জানত না, ঠিক ওই দিনটাই তাদের বিচ্ছেদের প্রস্তুতি-লগ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সিতারা ছেড়ে চলে যাওয়া মানে যে শমিতার আদর্শ বলে আর কোনো বালাই রইল না এই নিয়ে মন্ত্রপাঠ শুরু হয়েছিল। তারপর –।

"কতক্ষণ এসেছ?" – প্রভঞ্জন এসে পাশের আসনে বসি বসি ভঙ্গিতে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল।

শমিতা 'স্ট্র' সরিয়ে এক চুমুকে অবশিষ্ট পানীয় শেষ করে নিজের গ্লাস ফেলে রেখে একটু হেসেছিল। রীতিসম্মত উত্তর ওইটাই। প্রভঞ্জন বসতে বসতে সে হাত দিয়ে কপালের কাল্পনিক চুল সরিয়ে সোজা হয়ে বসে যাবে, যেন একটা সাক্ষাৎকার আসন্ন। নোটস্ নেবার জন্য ছোট্ট লাল বইটি বের করলেই হয়।

"অর্ডার দিয়েছ নাকি?"

"অর্ডার? খাবার? না, না, কী নেবে?" কী করে প্রভঞ্জন ভাবে যে শমিতা দুজনের হয়ে আগে অর্ডার দিয়ে দেবে। হঠাৎ কেনই বা দেবে? প্রভঞ্জন কি সত্যিই ক্রমশ ছেলেমানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে, না কি আসলে ও কোনদিনই বড় হয়নি? শমিতা মনের ভুলে ভেবেছিল, সোনালী মাছের স্বপ্ন দেখার মতো ভেবেছিল, প্রভঞ্জন, প্রভু, অনেক বড়। তার চেয়ে, সবার চেয়ে মস্ত মানুষ। সেই আরামদায়ক স্বপ্ন ছিল কতদিন, অনেকদিন, সিতারা কাগজ যখন তাকে ভাল করে সাংবাদিকতার ঢঙ শিখতে বিদেশে পাঠায় তখনও, সেই যে হাওয়া জাহাজের পথসঙ্গীর রকম দেখে সে হাসতে পেরেছিল, কেন, কেমন করে? জানত, প্রভুর মতো এমন মানুষ হয় না, খাঁটি মানুষ, পুরো মানুষ। না, দেবতা নয়, দেবতা-টেবতা ওসব তুলনা বাজে। মানুষ হবে মানুষ, ব্যস!

প্রভঞ্জন বসে মেনু উল্টোতে শুরু করেছিল। "সব তো দেবে না এখন বোধ হয়। এই সন্ধেকালে কি আর ডিনার – ফিশ মেয়োনিজটা বলে দেখি, কি বলো?"

"তোমার যেটা ইচ্ছে।"

"না, তুমিও খাবে তো?"

একটুখানি ফাঁপা হাসির বুড়বুড়ি উঠছিল শমিতার গলার কাছে ঃ কী হল কী প্রভঞ্জনের? কথা অবশ্য হয়ে আছে, সে-বারের মতো গোলমেলে কিছু করবে না সে, করবেই বা কী করে? সেবারে এসেছিল বাড়িতে। হঠাৎ ঝট করে শমিতাকে ধরে মেঝের ওপরে পাক খেয়ে যাওয়া, কিংবা আধা ব্যঙ্গ আধো কাতর স্বরে বলে ওঠা, "শমি, একবার, ফিন একবার। ব্যস্, হাও অ্যাবাউট দ্যাট?" এ সবই সম্ভব।

শমিতা তো আর তার প্রাক্তন স্বামীকে ধর্ষণের অপরাধে কাঠগড়ায় পাঠাবে না, দরকারও নেই তার। প্রভঞ্জন যে চালে তাকে মাত করবে ভেবেছিল তা যে হবে না শমিতা তা জানত। শমিতা কি আর 'হাতে প্রেমফুলহার' কনেটি? তাকে চলতে ফিরতে হয়, সর্বদা নিজেকে সাবধান, ওই বিজ্ঞাপনে যেমন বলে 'সুরক্ষিত' রাখতে হয়। একশ রকম বয়সের হাজার মতিগতির পুরুষের জগতে চলাফেরা, ওঠাবসা তার, সদা 'সুরক্ষিত' না থাকলে কবে কোথায় গায়ে পুলক লেগে চোখে ঘোর ঘনিয়ে শমিতার জন্মকালের স্বাধীন সাংবাদিকতার সাধ ঘুচিয়ে ছেড়ে দিত। তাই এমনিতেই সব সাবধান যেমনকার তেমনি তো ছিলই, প্রভঞ্জন চলে গেলে বাড়তি সে 'এনিমা'ও নিয়ে নেয় সেই রাতে নিজে নিজে। নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার মতো কী আর আছে। একটু কষ্ট, তাতে কী, তার পরে ঘুম, ভুলে যাওয়া। কিন্তু এ সব তো জানে না প্রভঞ্জন। তারপরেই শমিতার নোঙর তোলার পালায় কলকাতার সেই বাসা তুলে দেয় শমিতা। চুকে গেছে খোঁজ দেওয়া-নেওয়ার দায়। আর দেখা হয়নি, যোগাযোগও নয়। কলকাতার বাসিন্দা তো শমিতা এখন ঠিক নয়। ম্যানিলা, নিউইয়র্ক, কখনো প্যারিস ঘুরে ফিরে নানা স্থান ছুঁয়ে ফেরা কাজ, দেশে যখন কাজের টানেই বসে শমিতা তখন থাকে বম্বেতে। সেইখানে তার একখানি ঘরের ডেরায় শৌখিনতার চূড়ান্ত। বিদেশে দেশে মাখামাখিতে যে রকম সব ঘর বানিয়ে মূল্যবন্ত অতিথিসেবার কথা বাড়িওয়ালারা বড় শহরে এতদিনে ভেবে উঠতে পেরেছেন সেইরকম পেঁসিয়ঁ ধাঁচের চমৎকার নিদর্শন শমিতার আস্তানায় রয়েছে। নীড়-টিড় নয়, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। হলই বা অল্পদিনের, সুবিধে আরো সেইটাই, যখন আসবে, তখন পাবে, বেশ কথা, না? দৈবাৎ কখনো পুরনো শহর কলকাতায় ফিরলে কয়েক দণ্ডের হোটেল বাস, হাতে সময় থাকল তো ভাই বন্ধুদের কাছে এক চক্কর দিয়ে আসা। প্রভঞ্জন আর তার স্বজনবর্গের ডালপালায় ছেয়ে রয়েছে কলকাতা, অত তত্ত্ব কে দেয় তাকে, সেই বা নিতে যাবে কেন?

প্রভঞ্জন তার কার্ডটা টেবিলে নাড়াচাড়া করছিল, "এইটা ডিজাইন করে দিয়েছে বল্টু, বেশ ভাল করেছে না?"

ডিজাইনটা সম্ভবত সবটুকু কথা নয়। নিজের যোগাযোগ সূত্রে এগোতে এগোতে এখন প্রভঞ্জন প্রেস ক্লাবের পদাধিকারও অর্জন করে নিয়েছে সেটা ঘোষণা করাও এই সুন্দরদর্শন নিরীহ কার্ডটির অন্যতম উদ্দেশ্য মনে হয়। – "ক্লাবে বলছ না তুমি এবার?"

"না। কলকাতায় আমার সময় খুব কম। কাঁদির দিকে যেতে হবে একটা কাজে।"

"বম্বে হাই থেকে দৌড় একদম ফারাক্কায়?" – হাসল প্রভঞ্জন।

"বলতে পার।" – হাসল শমিতাও। কিন্তু প্রভঞ্জনের আসল কথাটা কি? বলছে না কেন? এই সব হালকা হালকা গল্পের মানে কি?

খাবার এসে গিয়েছিল। অল্প অল্প সুখাদ্যের টুকরো মুখে দিতে দিতে কথা বলছিল তারা। – "ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দিকটা তুমি ছুঁয়েই দেখলে না অথচ এত তৈরি ছিল কলম তোমার।"

"ওসব চুটকি গল্প, সাক্ষাৎকার, ভালো লাগে না আমার লিখতে।"

"তোমার উপন্যাস তৈরি হচ্ছে বেশ ফাস্ট।"

শমিতা সাড়া দিল না। এই বাঁকা কথাটা বললেই প্রভঞ্জনকে 'প্রভু' বলে চেনা যায়। এটা না বলে ও যেন পারছিল না। আরো কয়েক গ্রাস। একটু পানীয়। – "একাই আছ?"

"যেমন ছিলাম।"

"অর্থাৎ আছে সবাই, ঘিরে ধরে নেই কেউ।"

শমিতা হ্যাঁ-না সায় না দিয়ে জানতে চাইল, "তোমার কী কথাটা বলার জন্যে ডাকলে বললে না তো।"

"কিছু বলার জন্যে ডেকেছি না কি? না তো। আমার একটা মস্ত খণ্ড রয়ে গেছে তোমার জিম্মেদারিতে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করে সেটা কেমন আছে। এর মধ্যে আবার কথা কি!"

শমিতা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জলের গ্লাশ ধরেছিল ঠোঁটের কাছে। অল্প-অল্প করে জলে চুমুক দিতে ভাল লাগে। এই কথার পরে 'কী দেখলে' শুধোলে প্রভঞ্জন কি বলবে শমিতার এখনো কণ্ঠস্থ। বিচ্ছেদ-পূর্ব যুগে যখন ওদের তেতো কথা কাটাকাটির খেলা চরমে উঠেছে তখন প্রভঞ্জনের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল থেকে থেকেই তাকে 'ফ্রীজ বক্স' বলে উত্যক্ত করা যাতে সে ঝোঁকের মাথায় বলতে থাকে তার উষ্ণ অনুভবের কথা, তার সান্নিধ্যে মানুষের খুশি হয়ে ওঠার কথা। প্রভঞ্জনের হাতে হাতিয়ারের সীমাসংখ্যা থাকত না আর এরপরে। – 'বাঃ বাঃ, বাসুও তাহলে? বেশ, বেশ। দ্যাট নাগ বয়, ও ছোকরা ফাঁকে পড়ে গেল কেন? সবার শেষে বাকি যা রয় চাটতে দেবে না একটু তাকে?' কী যে হয়ে যেত প্রভঞ্জনের

চেহারা তখন, শমিতারও, নিশ্চয় শমিতারও। কী হত তাদের? কী হয়েছিল তাদের? কেন শমিতা রাশ টানতে পারত না নিজের কথার? একটা শেষ কথা বলে জিতে নেবার জন্যে দুজনের সেই লড়াইয়ে কথার পিঠে কথা বাড়িয়ে গেছে। না, এখন আর নয়। সামনের দিকে চেয়ে অকারণেই নিজেকে একটু টান-টান করে বসেছিল শমিতা। শমিতার কোনো ফ্রীজ বক্সের কোণে প্রভঞ্জনের জীবনের খণ্ডাংশ পুরে রেখে দেওয়ার সাধ কিংবা সাধ্য নেই শমিতার, ছিল না, কিন্তু কী হবে ও সব অনর্থক কথায়! কী হয়। মনে মনে শমিতা তখুনি স্থির করে ফেলছিলঃ না, স্কাই-রুম টুম নয়, কোথাও প্রভঞ্জনের সঙ্গে আর সে একা দেখাই করবে না। কোথাও যোগাযোগ করতে হলে দল বেঁধে, হ্যাঁ, সেই ঠিক ব্যবস্থা।

যখন বেয়ারা এসে খাবার পাত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন প্রভঞ্জন পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করে রাখছিল টেবিলে। বেয়ারা চলে যেতে তাকে বলতে শোনা যায়, "দেখতে পাচ্ছ না?"

"আমি 'স্মোক' করি না তো।"

প্রভঞ্জন ডান পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট আর দেশলাই বের করে ধরাতে ধরাতে বলেছিল, "ওতে সে সব বিশেষ কাগজ নেইও। খুলে দেখ।"

কিছু রঙিন ছবি রয়েছে শৌখিন বাক্সের মতো ওই অ্যালবামের ভাঁজের অভ্যন্তরে। নারী, শিশু। সুন্দর ছবি। "চিনতে পারছ?"

"নন্দিতা। নন্দিতার সঙ্গেই আছ এখনও?"

"আছি-টাছি নয়। বিয়ে করেছি আমরা লেটলি। ওই 'হেল' করে দিচ্ছিল 'লাইফ' বাচ্চা-বাচ্চা করে। ভেবেচিন্তে মনে হল সাদাসিধে পথ নেওয়াই ভাল।"

"ছেলে না মেয়ে?" জিগ্যেস করবে না করবে না করেও করে ফেলেছিল শমিতা। ভালই করেছিল। প্রভঞ্জন বলতে পারল, "ছেলে। নাম দিয়েছি রঙ্গন। ভাল নাম নয় বেশ? এই ফুলের নামটা বেশি দেয় না কেউ।"

শমিতা ছবি ফেরত দিতে-দিতে সায় দিয়েছিল প্রভঞ্জনের কথায়। সময় ফুরিয়ে আসছিল তার। ওঠা দরকার।

"তুমি দেখবে না একবার?"

"দেখলাম যে।"

"না, না, ওরকম দেখা নয়। তুমি নিজে একবার গিয়ে –। তোমার ইচ্ছে করছে না বাঃ, সত্যি ইচ্ছে করছে না? আমরা বন্ধু তো এখন আবার, বন্ধু না?"

শমিতা অবশ্যই মানে সে কথা, কিন্তু "সময় পাব না, সত্যি। পরে হয়ত একসময়ে, কেমন?"

"বেশ, তাই। দেখ, আমার দ্বারা কিছু তো হয়ে উঠল না। সময়টা হুশ্ করে ফুরিয়ে গেল যেন।"

"কী যে বল! সময় আবার তোমার এখনই ফুরোতে যাবে কেন?"

"উঁহু, বলতে দাও। গেল। আমার সময় গেছে আমি জানি। আমার হাত এখন খালি। কিন্তু ওই যে নতুন হাত-পা নিয়ে নেমে এল মানুষটা মাঠে, ও এখন চলবে অনেকদিন। ওই হাত-পা, মাথা বুকের মধ্যে শুধু আমি নেই, আমাকে ছাড়াও নন্দিতা, তারপর আমাদের এ-ও-সে পূর্ব পূর্বান্তর সব কত 'জেনারেশন' মিলিয়ে মিশিয়ে একটা নতুন ব্যাপারের চেষ্টায় রয়েছে। ধরতে পারছ কথাটা? আবার একটা সম্ভাবনা। আমি বলতে পারছি না ঠিক। কিন্তু তুমি দেখতে পেলে তুমি এর চেয়ে ঢের ভাল সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবে। দেখাটা আসল, না?"

"হ্যাঁ।"

"তবে দেখ। তুমিও শমি, একটা নতুন মানুষ রেখে যাও। না, না, আমার জন্য আবেদনপত্র রাখছি না, যেভাবে খুশি, যে দেবতাকে ইচ্ছে আহ্বান করো।"

হেসে যেন বেঁচেছিল শমিতা। "এ যে সেই লেজকাটা শেয়ালের গল্প হয়ে গেল। তোমাদের বাচ্চা হয়েছে। তুমি রয়েছ, তোমার বউ তো রয়েছেই, আরও নিশ্চয় আত্মীয়-স্বজন পাঁচজনে দেখছে তাকে। আর, আমি একটা একা মানুষ। আমার তো প্রথম সময়ই যাবে একগুচ্ছের তবে সে মনুষ্যসন্তান দেখা দেবেন, তার পরে আমার তো বউ নেই, হবেও না কেউ কখনো, কে ঝক্কি নেবে তার?"

"আঃ। সেই তোমার একঘেয়ে যুক্তিতক্ক চিরকাল।"

"কথাটা যে সেই একঘেয়েই প্রভঞ্জন, প্রথমে সেটাও ভেব।"

"না। অন্যভাবে দেখা যায় কথাটাকে। নিশ্চয়ই দেখা যায়। আমি বলছি দেখছিলেও তুমি অন্যভাবে, এখন তর্কের জন্যে পালটে দিলে শুধু সেটা।" বলতে বলতে এত সাবধানে ছবির সংগ্রহ তুলে নিয়েছিল প্রভঞ্জন যেন তার ছেলেকেই যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। শমিতার দিকে না চেয়ে কথা বলছিল তখন সে, "এই যে সংবাদ, সাংবাদিকতা, অনুসন্ধান, এসব কি? কী রেখে যাচ্ছ তুমি এসব দিয়ে যা একঘেয়ে নয়? বল আমায় বুঝিয়ে বল, স্কাউনড্রেলদের স্কীম উদ্ঘাটিত করে কিংবা দাগী বজ্জাতদের দাগগুলো মেলে ধরে এমন কী হল যা আগে হয়নি সর্বদা হচ্ছে না কিংবা পরে হবে না!"

উত্তেজনায় প্রভঞ্জনের মুখের ভাষা অন্যরকম শোনাচ্ছিল, গলার স্বর একটু চড়া, শমিতা মৃদুস্বরে বলেছিল, "সব ছিল, আছে, থাকবে। এসব কিছুই নতুন দিচ্ছি না আমি। তাতে কী? শিশুর কথা যে বলছ সেটা বুঝি আর কখনো ছিল না, এখনো নেই কিংবা আমি না দিলে আর কখনো হবে না?"

"থাকবে না কেন থাকবে কিন্তু তোমার দেওয়ার ব্যাপারটা –। কি বলব, অবুঝকে বোঝানো যায়, বোকা সাজলে তোমাকে আমি কী বোঝাব?"

"তবে আর কথা বাড়িয়ে কাজ কি!"

"না, কাজ নেই।" বলে নিতান্ত অকারণে বাঁ হাত দিয়ে টেবিলের নুনের পাত্র নাড়াচাড়া করতে করতে ডান হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার কথা এতক্ষণে মনে পড়ে যাওয়ায় খুব খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিয়ে প্রভঞ্জন ফেলে দিয়েছিল সিগারেট না নিবিয়েই। এইসব শৌখিন দোকানঘর চেনে অনেক মাতাল, বহু উজবুক অথবা সাজা-পাগলকে, এদের ছাইদানে তাই ঠিক ততটুকু জল দেওয়া থাকে যাতে জ্বলন্ত সিগারেটের অংশ পড়ে জ্বলে না আর, নিবে যায়। শমিতা উঠে আসার আগে শেষ কথা বলার মতন প্রভঞ্জন বলে ওঠে, "আমি তোমায় দেখিয়েছি কীভাবে নতুন করে কোর্ট সাজাতে হয়। আর আমাকে কেউ খেলা ভেস্তে দিয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী করো না।"

শমিতার উচিত ছিল চুপ করে চলে আসা। সে বলতে গেল, "কেউ কি দায়ী করেছে তোমায়?"

"সবাই। সবাই। তোমার ভাই যখন জানতে চেয়েছিল –"

"যাকগে, ও কথাটা থাক এখন।"

"তুমিই তো তুললে কথাটা।"

"ফিরিয়ে নিচ্ছি। চলি।"

"ফিরিয়ে নিলেই কথাটা ফিরে যাবে? এ কি তোমার পোষা কুকুরছানা?"

এই প্রশ্ন নিয়ে বেরিয়ে এলেও আজ সকালে এই সাক্ষাৎকার এমনি করে পুনরায় শমিতার মনের ভিতরে 'সম্প্রচার' হতে পারত কি না কে জানে, শুধু তো এটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি প্রভঞ্জন। চলে যাবার জন্যে শমিতাকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে হঠাৎ কেমন রাগ হয়েছিল যেন তার। "এখন

ছুটতে হবে কাগজ গোছাতে? কিসের কাগজ? লোকের পিছনে 'ফেউ' লেগে থাকা এই সব দায়িত্ব কি তোমার নেবার যোগ্য? এত ব্যস্ত তুমি তুচ্ছ দায় নিয়ে?"

শুধু কথার পিঠে কথার সূত্রে প্রশ্ন। তাও রাস্তায় এসে দাঁড়াবার আগে প্রভঞ্জন শমিতাকেই অনুকরণ করে বলেছিল, "যাকগে, ভাল থেক, ও কে? এসব প্রশ্ন ফিরিয়ে নিচ্ছি। আসলে তুমি জানই তো এসব প্রশ্নই নয়। জান না?"

শমিতা হেসে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে হ্যাঁ, এসব প্রশ্ন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তারপরে প্রভঞ্জন ফিরে গেছে দোকানঘরের ভিতরে। সে নাকি ওখানেই একটুক্ষণ আরো কাটাতে চায়। কিংবা হতে পারে সে কিছু একটা ফেলে এসেছে অন্যমনস্কভাবে ওখানে সে কথাটা না বলে এইটা বলল। যাই হোক, তাতে শমিতার কিছু নয়। তাকে যে কথা দিয়ে প্রভঞ্জন এনেছিল সে কথার খেলাপ হয়নি, আবার কি! রাগ বা অনুরাগ কোনটাকেই বাড়াবাড়ি করতে না দিয়ে শান্তভাবে শমিতাকে চলে আসতে দেওয়া, তারপরে পথে কিংবা হোটেলে কাল রাত্তির থেকে আজ সকালবেলা পর্যন্ত আর একবারও যোগাযোগের চেস্টা না করার জন্য প্রভঞ্জনের কাছে শমিতা বেশ কৃতজ্ঞ।

রাত্রে প্রভঞ্জন তাকে বিব্রত না করা সত্ত্বেও যদি শমিতার ঘুমের ওষুধের দরকার একটুখানি হয়ে থাকে তার কারণ বড্ডই গরম ছিল কাল বহুক্ষণ, আর বাইরে ঘুরে ঘুরে সেই গরম শরীর ভরে এনেছিল তো সে যতই কেননা ঘর ঠান্ডা হয়ে থাক। ক্লান্তিটা জমেই ছিল। কে না জানে ভয়ানক ক্লান্তিতে ঘুম আসতে চায় না। অন্তত শমিতা এইটা আগেও দেখেছে, ঘুম আসি আসি করে ঠিকমত ধরে না সবটুকু, শরীর ঝিম মেরে যায়। শমিতাও সেজন্যেই পুরো যেন ভেবে উঠতে পারছিল না কেন ঘুম আসছে না পুরো। গোলমাল কিসের! এখন সকালে গাড়িতে যখন কলকাতা শহর প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে, ভিজে জানলার কাচে মুখ রেখে শমিতার একটু একটু মনে পড়ছে বড্ড গোলমাল করছিল প্রশ্ন-সেজে-থাকা কিছু কথা। না, প্রভঞ্জন বিব্রত করতে চায়নি তাকে, ফিরিয়ে নিতেই চেয়েছিল প্রশ্নদের কিন্তু সম্ভবত প্রভঞ্জনের সেই ভদ্রয়ানার চেয়ে আগের কথাটা ঢের বড় সত্যি তাই ওই প্রশ্নগুলোকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়নি। ফেরালেও সব প্রশ্ন ফেরে না। কারোরই পোষা কুকুরছানা নয় সে সব প্রশ্ন। তাইজন্যেই, নয়ত আর কিসের জন্যে, যতক্ষণ কাল রাত্রে বাইরে বাইরে কাজে, দেখাসাক্ষাৎ যোগাযোগে ঘুরল শমিতা রাস্তা আর দু ধারের সারি সারি বাড়ির নিঃশ্বাস ছাড়ার মতো ছেড়ে দেওয়া তাপ হাওয়ায় হাওয়ায় এসে সঞ্চারিত হয়ে গেল শমিতার শাড়িতে, চুলের ভাঁজে, চামড়ায়, ততক্ষণ এ সমস্ত একেবারে আকাশের মতো থেকেও না থাকা ছিল আর যেই ঘরে ফিরল ঠান্ডায় জুড়োতে অমনি এল তারা। ধরতে না চাইলেও তখনই শমিতা ঠিকই ধরতে পারছিল প্রশ্নদের জাতচরিত্র। না, পোষা কি পোষ-না-মানা কোনরকম কুকুরই নয় এ সব প্রশ্ন। ছিঁড়েও খাবে না, পায়ে-পায়েও ঘুরবে না। এই প্রশ্নগুলো যেন অসময়ে উড়িয়ে দেওয়া দলছাড়া ছোট-ছোট পাখির মতো। জানলার খড়খড়িতে ফিরে ফিরে ঠোকর দিচ্ছে তারা, উড়তে শেখেনি, দলে গিয়ে ভিড়তে পারেনি অথচ বাসা নামে সেই খাঁচাটায় ফিরবার পথও আর নেই ওই অসাবধানে ছেড়ে দেওয়া প্রশ্নদের। কত যে ওরা ঘুরল ফিরল, অবুঝ পাখা ঝাপটানির শব্দে জাগিয়ে রাখল শমিতাকে। বহুক্ষণ, বহু বহুক্ষণ। চিনতে ইচ্ছে করছিল না বলে শমিতা তখন চোখ বুজে নিজেকে শুধুই ক্লান্ত ভেবেছিল। ভেবে ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে একটা কামপোজ আর এক গ্লাস জল গুছিয়ে নিয়েছিল চট করে। রাত্রে ক্লান্তি ঘোচাতে না পারলে দিনে কাজ হবে না। দীর্ঘ গাঢ় একটা ঘুম পেলেই, বাস্! আর কিছু চাই না। তবু না চাইলেও স্বপ্ন চলে আসে। ঘুমের ভিতরে ভাবনা ধরে।

প্রভঞ্জন বলতে এসেছিল চাই আরও কিছু। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তার জন্য কোর্ট ছেড়ে দেওয়া, পথ করা ভাবী মানুষের। ঘুমের বড়ি মুখে দিয়ে জলটুকু ফুরিয়ে ফেলবার আগে সে এই পর্যন্ত ভেবেছিল। কেন তুমি কান দিতে অনিচ্ছুক এ সব কথায়? তুমি বুঝি জেনে বসে আছ হয় তোমার মতন না হয়ত আমার এই রকম আঁটিবাঁধ ভাগ হয়ে গিয়েছে পৃথিবী? কত মর্কটদের পার হয়ে ভাল মানুষেরা আসতে পারে তবু সময় তো লাগে। তোমার আমার সকলের চেয়ে ঢের ঢের ভাল মানুষেরা জন্মে ভরে তুলবে পৃথিবী, আমাদেরই ব্যবহার করে। মানুষ তৈরির মজা এই। মজা।

তন্দ্রাচ্ছন্ন শমিতার ভাবনার উপরে বৃষ্টি নেমেছিল বড় বড় ফোঁটায়।সেই বৃষ্টি পড়ছে সকালেও। এখন সম্মুখে ঢের কাজ। আর সঙ্গে আছে দে-সরকার। কথাই ছিল তার নিজের যাওয়ার, শমিতা চৌধুরী এসে যাওয়ায় এই যাত্রায় মাহাত্ম্য এসে গেছে। বেশ চটপটে ভাব, ভিতরে ভিতরে তাকে কথা বলার জন্যে তৈরি মনে হয়। কিন্তু সে গাড়িতে ওঠার মুখেই বলে নিয়েছে যে শমিতার চুপ করে পথচলার অভ্যাস সে জানে। এ জন্য হাতের বই মুখের সামনে খোলা তার। ত্যক্ত করতে চায় না শমিতাকে। ভাল, সবই ভাল। কিন্তু ওকে একটু চা তো দেওয়া উচিত। পায়ের নিচে রেখে দেওয়া টুকরি থেকে 'ফ্লাস্ক' বের করে শমিতা বাইরে রাখল। দে-সরকার বই বন্ধ করে তাকে নজর করছে যেন অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পর পর দুটো নতুন ভাঁড় বের করে শমিতা হাসল, "ভাঁড়ে চা খেতে আপনার আপত্তি নেই তো?"

"ভাঁড়ই তো সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর।" – বই সরিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিল দে-সরকার।

"সোজা যাচ্ছি তো ভৌমিকদের ওখানে।"

"সেখানেই সমস্ত ব্যবস্থা মজুত থাকবে। আপনার জন্যে সবাই উপস্থিত থাকবেন ওখানে।"

"সে কি, আমি যে ভেবেছিলাম ওখানে একটু থেমেই তারপরে আমি নিজেই ঘুরে ঘুরে –"

দে-সরকার ব্যস্ত হয়ে বলে, "আপনার যেরকম ইচ্ছে সেইভাবেই করবেন কাজ। ওরা শুধু সবাই আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে চান। সকলের দারুণ বিশ্বাস তো আপনার ওপরে।"

হাসি-হাসি মুখে নিজের প্রশংসা নিতে নিতে শমিতা আড়চোখে বাইরের বৃষ্টিটা লক্ষ্য করে। কে সাধু আর কে 'স্মাগলার' সেসব নাকি শমিতা এক পলক দেখলে বুঝতে পারে। সত্যি পারে? ইচ্ছে না করলেও চোখ পড়বেই তার ঠিক ঠিক অনুসন্ধানের সূত্রে? না, তা নয়। ইচ্ছেটা করানো খুব দরকার। সব কাজে, সর্বদাই। অতঃপর শমিতা চৌধুরী, মন দিয়ে এইবার ইচ্ছে করো, সম্মুখেই কাজ। নিজের নাম নিজের মনের কানে কানেও উচ্চারিত হতে শুনলে শমিতার মনোবল বেড়ে যায়।

শুধু বৃষ্টির চেহারা উন্মনা করে রাখে তাকে। সঙ্গ নিয়েছে বৃষ্টি। "বৃষ্টি আজ থামবে মনে হচ্ছে মিস্টার দে-সরকার?"

বুদ্ধিমতী মহিলার মুখে সরল শিশুর মতো প্রশ্ন শুনে হাসতে থাকে দে-সরকার, "থামবে মানে কি, ওখানে পৌঁছে হয়ত দেখবেন মোটে বৃষ্টি হয়ইনি।"

শমিতা এক পলক ভাবল যেন। তারপরে বলল, "কী করে জানলেন? আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি তো।"

খেলার মাঠে মেয়েরা পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে?

প্রদীপ দে

মেয়েরা কি পুরুষদের অতিক্রম করতে পারবে? বিভিন্ন কাজে, নানা ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রশ্নটি শোনা যায়। খেলাধূলায় প্রশ্নটি আরও বেশি। এই ১৯৮৪তেও অনেক খেলায় মেয়েদের অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। বাধা দেন চিকিৎসকরাও। খেলতে দেওয়া হয় না শারীরিক কারণে। কিছুদিন আগে দূরপাল্লার দৌড়গুলিতে অংশ নিতে দেওয়া হত না একই আশঙ্কায়। কিন্তু এবার লস এঞ্জেলেসে দেখা গেল ম্যারাথন মেয়েদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। দ্বিমত আছে ফুটবল নিয়ে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয়, তবে তা কেবল পুরুষদের খেলা। অগ্রণী দেশ পশ্চিম জার্মানিতে ফুটবলে মেয়েদের বাধা নিষেধ নেই, কিন্তু বলা হয় মেয়েরা অন্য খেলা খেলুক না! অথচ শারীরিক আঘাতের আশঙ্কা বাস্কেটবল বা আমাদের কবাডিতেও কম নেই। এই নিবন্ধে কেবল মেয়েদের অ্যাথলেটিক্স নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

অ্যাথলেটিক্স যদি সব খেলার আদি হয়, তাহলে আক্ষরিক অর্থে অন্তত মেয়েরাই সব খেলাধূলার উৎসে এবং সেইজন্যই বোধহয় অ্যাথলেটিক্সের জগতে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের অগ্রগতি ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখেছেন – তিরিশের দশকে যেখানে ১০৮টি রেকর্ডের মধ্যে মেয়েদের দাবি ছিল ১২টি সেখানে পঞ্চাশের দশকে ১৯৭টি রেকর্ডের মধ্যে মেয়েদের হয় ৭৬টি। আর ষাটের দশকে যখন মেয়েরা ২৫১টি রেকর্ডের মধ্যে ৯৫টি দখল করে তখনও পুরুষরা বুঝতে পারেননি, এরাই সত্তর দশকে ২১৪টির মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ ১১৮টি রেকর্ড দখল করে প্রমাণ করবেন পুরুষরা আপাতত সিংহাসনে আর বসে নেই। অনেকে মনে করছেন – মেয়েরা যদি সব বিভাগে পুরুষদের মত সুযোগসুবিধা পান, তাহলে এই শতকেই আরও ২০ শতাংশ রেকর্ড উন্নত হতে পারে এবং ক্রীড়াগত পার্থক্য শূন্যে নামতে পারে।

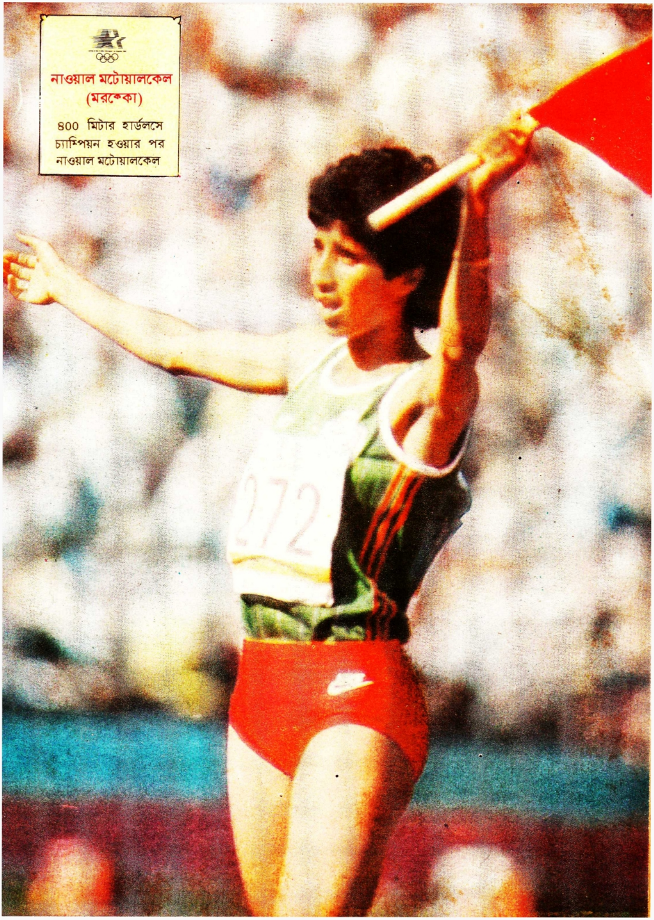
তাই লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিক্স কিংবা ফ্রেন্ডশিপ-৮৪-র দৌলতে যখন সারা বিশ্বের ক্রীড়া পণ্ডিতরা বিশ্বরেকর্ড হিসাব করার জন্য ব্যস্ত, তখন সোভিয়েত ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা আগামী শতাব্দীর স্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত। ইতোমধ্যেই সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মস্কো ওলিম্পিক্সে রেকর্ডের নমুনা দেখে ২০০০ সালের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেছে – ১৯৩৬ বার্লিন ওলিম্পিক্স থেকে ১৯৮০ মস্কো ওলিম্পিক্স পর্যন্ত ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ২২ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে এবং সেই গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আগামী শতাব্দীর মেয়েদের স্বপ্ন তৈরি করা হয়েছে। তবে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের আগামী শতকের অনুমান কিছুটা বিশ্বাস্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য হবে কিনা, তা পুরোপুরি নির্ভর করছে অ্যাথলিট এবং অ্যাথলেটিক্সের সাজ-সরঞ্জামের ওপর। অবশ্য সাজ-সরঞ্জামের আধুনিকতা যে-হারে বাড়ছে, তাতে ইণ্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সহ-সভাপতি লেওনিড খোমেনকভ মনে করছেন – ১৫ থেকে ২০ শতাংশ রেকর্ডের উন্নতি হতে পারে।

স্বপ্ন ভেঙে চুরমার

১৯৮২ জুনে এথেন্সে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১৮ বছরের বালগেরিয়া তরুণী অ্যানটোনেলা টডোরভা যখন ৭১.৮৮ মিটার জ্যাভেলিন ছুঁড়লেন, তখন ইতালির স্পোর্টস ম্যাগাজিন 'লা গেজেটা' বলে ফেলে – পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বোধহয় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তবে পৃথিবীর শক্তি যে সত্যি কমে যাচ্ছে তার প্রমাণ দিলেন, ১৯৮৩-র জুনে ফিনল্যান্ডের একটি ২১ বছরের মেয়ে টিনা লিলাক ৭৪.৭৬ মিটার দূরে অবিশ্বাস্যভাবে জ্যাভেলিন ছুঁড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য – সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা বহু হিসেব করে ভেবেছিলেন, একজন মেয়ের পক্ষে ২০০০ সালে বড়জোর ৭৪.৪০ মিটার জ্যাভেলিন ছোঁড়া সম্ভব। কিন্তু সেই সোভিয়েত স্বপ্ন ইতোমধ্যেই ভেঙে দিয়েছেন টিনা লিলাক। সোভিয়েত স্বপ্নের চেয়ে আরো ৩৬ সেন্টিমিটার দূরে জ্যাভেলিন ছুঁড়ে লিলাক বিশেষজ্ঞদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছেন। টিনা লিলাকের মতই আরেকজন উদীয়মান লং জাম্পার বিশেষজ্ঞদের চিন্তায় ফেলেছেন। গত বছর জুনে বুখারেস্টে রোমানিয়ান মেয়ে অ্যানিলেয়ারা কাসমির নিজেরই গড়া ৭.২১ মিটারের বিশ্বরেকর্ডের চেয়ে ২২ সেন্টিমিটার বেশি ৭.৪৩ মিটার লাফিয়ে লংজ্যাম্পে রেকর্ড গড়ে যথারীতি সোভিয়েত স্বপ্ন আবার ভাঙেন। কারণ বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন ৭.৪০ মিটারের বেশি লাফানো সম্ভব নয়। কিন্তু কাসমির ৭.৪৩ মিটার লাফিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন আগামী শতাব্দীর স্বপ্নে কিছু গোলমাল আছে।

অনুমান বনাম প্রমাণ

মেয়েদের সব ব্যাপারেই যেন হিসেবটা একটু গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। কারণ গত এক দশক ধরে যে তিন মেয়ে (সোভিয়েতের তামারা বাইকোভা, পশ্চিম জার্মানির উলরিখে মেইকার্থ, ইতালির সারা সিমোনি) হাইজাম্পে জোর লড়াই চালাচ্ছিলেন, সেই তিনজনকে হঠাৎ টপকে গেলেন বালগেরিয় মেয়ে লুদমিলা অ্যানডোরভা। গত বছরেই প্রায় তিনবার বিশ্বরেকর্ড করে তিনজনই তিনজনকে টপকাবার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সারা সিমোনি – ২.০৩ মিটার, উলরিখে মেইকার্থ – ২.০৪ এবং তামারা বাইকোভা – ২.০৫ মিটার ওপরে ওঠেন। সকলকে টেক্কা মেরে লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিক্সের ঠিক আগে লুদমিলা ২.০৭ মিটার লাফিয়ে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের তোলপাড় তোলেন এবং ব্যাপারটা যে আচমকা ঘটে যায়নি তার প্রমাণ হিসেবে লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিক্সের ঠিক পরেই মস্কোয় ফ্রেন্ডশিপ প্রতিযোগিতায় আবার ২.০৭ মিটার লাফান অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের অনুমান বনাম প্রমাণের লড়াই বেশ জোর কদমে চলছে। বিশেষজ্ঞরা যে-হারে রেকর্ডের উন্নতি হিসেব করছেন, আর প্রতিযোগীরা যে-হারে উঁচুতে উঠছেন, তাতে আবার বোধহয় এই শতকেই কিছু গোলমাল হতে পারে। লুদমিলার মত আরেক সোভিয়েত অ্যাথলিট স্টেপানোভা ৪০০ মিটার হার্ডলসে প্রায় স্বপ্নের কাছাকাছি চলে এসেছেন। কারণ বিশেষজ্ঞরা যেখানে ৪০০ মিটার হার্ডলস পার হবার জন্য



নাওয়াল মটোয়ালকেল
(মরক্কো)

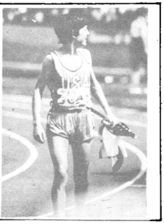
৪০০ মিটার হার্ডলসে
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর
নাওয়াল মটোয়ালকেল

৫৩.৫০ সেকেন্ড অনুমান করেছেন, সেখানে ইতোমধ্যেই গত ফ্রেন্ডশিপে স্টেপানোভা ৫৩.৬৭ সেকেন্ডে পার হয়ে গেছেন অর্থাৎ অনুমানের চেয়ে আর মাত্র ১৭ শতাংশ সেকেণ্ড বেশি। প্রসঙ্গত জানাই স্টেপানোভাই পৃথিবীর প্রথম মেয়ে যিনি ৫৪ সেকেন্ডের কমে ৪০০ মিটার হার্ডলস পার হবার মত সাহস দেখালেন এবং আরো হয়তো দেখাবেন।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সভাপতি আদ্রিয়া পল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একদা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন – স্প্রিন্টে পূর্ব জার্মান মেয়েদের আধিপত্য ভেঙে যেমন নতুন রেকর্ড করা শক্ত, তেমনি মাঝারি পাল্লায় সোভিয়েত শক্তি পেরিয়ে রেকর্ড করাও শক্ত। বলা বাহুল্য দুটোই প্রায় সহজ হয়ে গেছে মার্কিন এবং চেকোশ্লাভাকিয়ার দৌলতে। ১০০ এবং ২০০ মিটারে পূর্ব জার্মানির মারলিস গোহর ও মারিথা কখের গর্ব খর্ব করার জন্য যেমন মার্কিন অ্যাথলিট ইভলিন অ্যাশফোর্ড প্রস্তুত, তেমনি চেকোশ্লাভাকিয়ার জারমিলা ক্রাতাভি-লোভা ইতোমধ্যেই সোভিয়েত শক্তি ভেঙে ৪০০ ও ৮০০ মিটারে বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছেন এবং অনুমানের প্রায় পাশাপাশি। যদিও ১৫০০ মিটারে এখনও সোভিয়েত অ্যাথলিট তাতিয়ানা কাজানকিনার বিশ্বরেকর্ড ভাঙার মত সাহস কেউ দেখাতে পারেননি।

বিশ্বের দ্রুততমার দুঃখ

গত বছর জুনের একটি ছোট খবর। পৃথিবীর এক নম্বর উঠতি মার্কিন অ্যাথলিট ইভলিন অ্যাশফোর্ড গত বছর কলোরাডোয় ১০.৭৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার পার হবার দৌলতে বিশ্বের দ্রুততমা এবং এ বছর লস এঞ্জেলেসে ১০.৯৭ সেকেন্ডে সোনা পাবার দৌলতে ওলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন। এই চ্যাম্পিয়নকেও একদা দিনের পর দিন দুঃখের জল ফেলতে হয়েছে। কারণ ১৯৮০ মস্কো ওলিম্পিক্সের সময় ইভলিন অ্যাশফোর্ডই ছিলেন পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে যিনি ১১ সেকেন্ডের কমে ১০০ মিটার এবং ২২ সেকেন্ডের কমে ২০০ মিটার অতিক্রম করেছিলেন। স্বভাবতই তৎকালীন বিশেষজ্ঞরা মস্কো ওলিম্পিক্সের আগেই অগ্রিম চ্যাম্পিয়ন হিসেবে অ্যাশফোর্ডকে সবচেয়ে ফেবারিট ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত অর্থাৎ আমেরিকার মস্কো ওলিম্পিক্স বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাশফোর্ডের



লস এঞ্জেলেস ম্যারাথনে বিজয়িনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোয়ান বেনোয়েট

ওলিম্পিক্স ডাবলের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। অ্যাশফোর্ড একদা দৌড় ছেড়ে দেবার কথা পর্যন্ত ভেবে ফেলেছিলেন। কিন্তু বহু শুভানুধ্যায়ী পরের বছর আবার অ্যাশফোর্ডকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনেন এবং দ্রুত থেকে দ্রুততর হবার জন্য শুরু হয় রাতদিন চোখ বুজে শুধু প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। সকালে যেমন ট্র্যাকে প্র্যাকটিস, তেমনি বিকালে পাহাড়ের ওপর কিংবা সমুদ্রের ধারে অথবা জিমন্যাসিয়ামে প্র্যাকটিস। সকালে প্রায় আটবার স্প্রিন্ট টানার পর সিঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে দশবার ওঠানামা এবং ক্রমে ডান পা পাঁচবার তারপর বাঁ পা পাঁচবার মাথার ওপর তুলে হপস করে তবে সকালে ছুটি। বিকালে পাহাড়ের ওপর ২৫ বার ওঠানামা কিংবা সমুদ্রের ধারে ৫০ পাক দৌড় অথবা জিমন্যাসিয়ামে ১০০টা পি টি করে তবে দিনের রুটিন শেষ।

মস্কো ওলিম্পিক্সের দুঃখ ভোলার জন্য দুই পূর্ব জার্মান বিশ্বরেকর্ডধারী যথাক্রমে ১০০ মিটারে মারলিস গোহর এবং ২০০ মিটারে মারিথা কখকে বারবার পর্যুদস্ত করে তোলার জন্য অ্যাশফোর্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ছ' বার মুখোমুখি হবার দৌলতে পাঁচবার অ্যাশফোর্ড জয়লাভ করে বুঝিয়ে দেন ওলিম্পিক্স খেতাবটাই সব নয়। শেষ পর্যন্ত গত বছর জুনে কলোরাডোয় মারলিস গোহরের বিশ্বরেকর্ডের (১০.৮১ সেকেন্ড) চেয়ে ২ শতাংশ সেকেন্ড কমিয়ে ১০.৭৯ সেকেন্ডে শত মিটার পার হয়ে বিশ্বের দ্রুততম মেয়ের খেতাবটি ছিনিয়ে নেন। তবে মারিথা কখকে সম্মুখ সমরে বারবার হারিয়েও অ্যাশফোর্ড এখনও পর্যন্ত ২০০ মিটারের বিশ্বরেকর্ডটি কাড়তে পারেননি। এবারে লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিক্সে ১০০ মিটারে চ্যাম্পিয়ন হবার পর এখন অ্যাশফোর্ডের চোখে ২০০ মিটার চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন।

পুরুষের ছদ্মবেশে মেয়ে

পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবার জন্য কতবার যে মেয়েদের ছদ্মবেশে ধরতে হয়েছে, তার তালিকাটি বেশ বড়। প্রাচীন গ্রিসে ওলিম্পিক্সের নিষিদ্ধ অঙ্গনে যেমন পুত্র পেসিডোরামের হাত ধরে পুরুষের ছদ্মবেশে মা ফেরোনিস ঢুকেছিলেন, তেমনি পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য ১৯৬৭ সালে বোস্টন ম্যারাথনে পুরুষের ছদ্মবেশে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন কাথে সুইজার। ১৯৬৭ সালে যখন মার্কিন শহরে মেয়েরা ম্যারাথনে দৌড়বার অধিকার পাননি, তখন কাথে সুইজার 'কে সুইজার' নামে মাঠে নামতে গেলেন এবং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ব্লেজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লেন তিনি। বোস্টন ম্যারাথনের এক কর্মকর্তা প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে চান। তবু সুইজার ছোটেন। তবে এই অপমান সুইজার মুখ বুজে সহ্য করেননি এবং ব্রাজিল থেকে ফিলিপিন্স সারা বিশ্বে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন ওলিম্পিক্সে ম্যারাথন আন্দোলনের জন্য। ম্যারাথন লস এঞ্জেলেসে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সেই ঐতিহাসিক ওলিম্পিক্স ম্যারাথনে প্রথম হলেন জোয়ান বেনোয়েট ২ ঘ: ২৪ মি: ৫২ সেকেন্ডে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ রাস্তা অতিক্রম করে এবং বেনোয়েটের পরেই যার ভাল সময়, নিউজিল্যান্ডের সেই অ্যালিসন রো পুরুষের মর্যাদায় হাত দিতে পারেন। অ্যালিসন শুধু ম্যারাথনেই দৌড়ন না, তিনি ট্রাইথলন নামে একটা নতুন প্রতিযোগিতায় ছেলেদের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা করেন। ট্রাইথলনে একই সঙ্গে ২.৪ মাইল সাঁতার কাটতে হবে, ১১২ মাইল সাইকেল চালাতে হয় এবং ২৬.২ মাইল ম্যারাথন দৌড়তে হয়। অনেকে মনে করেন এ কাজ মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অ্যালিসন ১৯৮২ সেপ্টেম্বরে মাইটি হ্যাম্পটিনম ট্রাইথলনে নেমে অনেকের অনুমান মিথ্যা করে দেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আগামী শতকে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে ক্রীড়াগত পার্থক্য হয়তো আর থাকবে না। লস এঞ্জেলেসে ম্যারাথন জিতে জোয়ান বেনোয়েট যখন ইন্টারভিউ হলে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সামনে এলেন, তখন জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ এর পর আপনার লক্ষ্য কী?

বেনোয়েট আঙুল তুলে পুরুষ সাংবাদিকদের দেখিয়ে বললেনঃ আপনাদের ধরা, পুরুষদের রেকর্ড স্পর্শ করা।

ছবিঃ অমিয় তরফদার

র‍্যাগল্যান হাতের কার্ডিগান

শীতকালে যদিও গায়ে একটা চাদর জড়াতে পারলেই সবচেয়ে আরাম, তবু সবসময়েই তো চাদর জড়িয়ে রাখা যায় না। কারণ চাদরের অসুবিধেও আছে অনেক। তাই যদি একটা কার্ডিগান গায়ে দেওয়া যায় তাহলে পরেও আরাম আর অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করা যায়। এবারে খুব সহজে বোনা যায় এরকম একটি কার্ডিগানের কথা বলা হল। বেশি শীত করলে বোতাম লাগিয়ে রাখুন, বেশ আরাম পাবেন। আর দুপুর-টুপুরে বেরোতে হলে বোতাম খুলেই রেখে দিন। ঝরঝরে, ঝাড়া হাত-পা হয়ে ঘুরে বেড়ান।

কার্ডিগানের মাপ ঃ

বুক – ৩৪-৩৬ ইঞ্চি, ঝুল – ২৭ ইঞ্চি। আর কার্ডিগানটি বুনতে যা যা লাগবে তা হল ৩০০ গ্রাম ৪ প্লাইক্যাশমিলন উল। তবে উলের ব্যাপারে তারতম্য হতে পারে। যদি ডবল নীটিং উল ব্যবহার করা হয় তাহলে বেশি লাগবে। আবার যদি ৪ প্লাই কিন্তু বেশ ভাল উল দিয়ে বোনা হয় তাহলে কমই লাগবে। এছাড়া এমনিতে ১ জোড়া ১০ নং ও ১ জোড়া ৮ নং কাঁটা লাগবে। তবে কাঁটার ব্যাপারেও ডবল নীটিং উল হলে বেশি মোটা কাঁটা ব্যবহার করতে হবে স্বভাবিকভাবেই। বুনতে হবে এইভাবে – প্রথমে ১০নং কাঁটায় ৯৬ ঘর তুলে পিছনের খন্ড বোনা আরম্ভ করুন।

বর্ডার ঃ ১ম কাঁটায় সব উল্টো। ২য় কাঁটায় সব সোজা। ৩য় কাঁটায় আবার সব সোজা ও ৪র্থ কাঁটায় সব উল্টো বুনুন। তারপর আবার ১ম কাঁটা থেকে ৪র্থ কাঁটার মত বুনে যান। এভাবে মোটা ৫বার হলে দেখা যাবে ৫টা মোটা উঁচু উঁচু লাইন পড়বে। এবারে বর্ডার শেষ হল। তারপর ৮নং কাঁটায় ১ কাঁটা সোজা ও ১ কাঁটা উল্টো বুনে ডিজাইন আরম্ভ করুন এইভাবে।

১ম কাঁটা – * ৯ উঃ, ৯ সোঃ, ১ উঃ, ১ সোজা *। এইভাবে তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুই বার-বার বুনে যান। ধারে কেবল ৭ সোঃ পড়বে।

২য় কাঁটা – সব উল্টো।

৩য় কাঁটা – ১ সোঃ * ৮ উঃ, ৮ সোঃ ২ উঃ, ২ সোঃ*। এইভাবে তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু পরপর বুনে যান শেষে কেবল ৭ সোঃ।

৪র্থ কাঁটা – সব উল্টো।

৫ম কাঁটা – ২ সোঃ*৭ সোঃ, ৩ উঃ, ৩ সোঃ*। এইভাবে তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুর পুনরাবৃত্তি করে যান। ধারে ৭ সোঃ।

৬ষ্ঠ কাঁটা – সব উল্টো।

৭ম কাঁটা – প্রথমে ৩ সোঃ তারপর ৬ উঃ, ৬ সোঃ, ৪ উঃ, ৪ সোঃ, আবার ৬ উঃ, ৬ সোঃ, এইভাবে বুনে যান। এবারে ধারে ৬ সোঃ, ১ উঃ হবে।

৮ম কাঁটা – সব উল্টো।

৯ম কাঁটা – ৪ সোঃ, তারপর ৫উঃ, ৫ সোঃ, ৫উঃ ৫ সোঃ, এইভাবে গোটা কাঁটা, ধারে ৫ সোঃ, ২ উঃ।

১০ম কাঁটা – সব উল্টো।

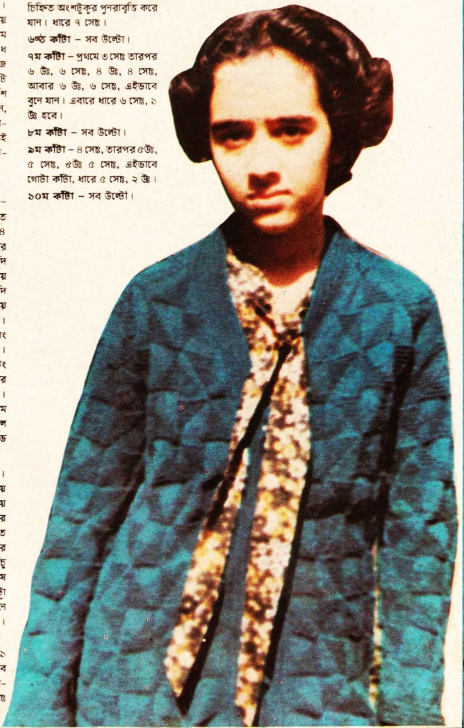
১১শ কাঁটা – প্রথমে ৫ সোঃ, তারপর ৪ উঃ, ৪ সোঃ, ৬ উঃ, ৬ সোজা। আবার ৪ উঃ, ৪ সোঃ ইত্যাদি। শেষে ৪ সোঃ, ৩ উঃ।

১২শ কাঁটা – সব উল্টো।

১৩শ কাঁটা – ৬ সোঃ, তারপর ৩উঃ, ৩সোঃ, ৭উঃ, ৭সোঃ, আবার ৩ উঃ, ৩ সোঃ থেকে একই রকমভাবে গোটা কাঁটা বুনে ধারে কেবল ৩ সোঃ, ৪ উঃ।

১৪শ কাঁটা – সব উল্টো।

১৫শ কাঁটা – ৭ সোঃ বোনার পর



কেবল * ২ উঃ, ২ সোঃ, ৮ উঃ, ৮ সোঃ*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুর পুনরাবৃত্তি। ধারে ২ সোঃ, ৫ উঃ।

১৬শ কাঁটা – সব উল্টো।

১৭শ কাঁটা – ৮ সোঃ বুনে নিয়ে * ১ উঃ, ১ সোঃ, ৯ উঃ, ৯ সোঃ*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুরই পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া। শেষে ১ সোঃ, ৬ উঃ।

১৮শ কাঁটা – সব উল্টো।

১৯শ কাঁটা – প্রথমে ৮ উঃ,*১ সোঃ, ১ উঃ, ৯ সোঃ, ৯ উঃ*। তারকা-চিহ্নের মধ্যে যেভাবে আছে সেইভাবে সবটা বুনে গিয়ে ধারে ৬ সোঃ।

২০শ কাঁটা – সব উল্টো।

২১শ কাঁটা – প্রথমে ৭ উল্টো বুনে শুধু ২ সোঃ, ২ উঃ, ৮ সোঃ, ৮ উঃ এইভাবে শেষ পর্যন্ত বুনে ধারে ৬ সোঃ।

২২শ কাঁটা – সব উল্টো।

২৩শ কাঁটা –প্রথমে ৬ উল্টো বুনে নিয়ে * ৩ সোঃ, ৩ উঃ, ৭ সোঃ, ৭ উঃ*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুর পুনরাবৃত্তি করে যান। এবারে ধারে ৫ সোঃ।

২৪শ কাঁটা – সব উল্টো।

২৫শ কাঁটা – প্রথমে ৫ উঃ বুনে * ৪ সোঃ, ৪ উঃ, ৬ সোঃ, ৬ উঃ*। এইভাবে তারকা-চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশিত অংশটুকুরই কেবল পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সবশেষে ৪ সোঃ।

২৬শ কাঁটা – সব উল্টো।

২৭শ কাঁটা – ৪ উঃ *, ৫ সোঃ, ৫ উঃ, ৫ সোঃ, ৫ উঃ*। শেষে ৩ সোঃ।

২৮শ কাঁটা – সব উল্টো।

২৯শ কাঁটা – ৩ উঃ,*৬ সোঃ, ৬উঃ, ৪ সোঃ, ৪ উঃ*। কেবল তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুর পুনরাবৃত্তি। শেষে ২ সোঃ।

৩০শ কাঁটা – সব উল্টো।

৩১শ কাঁটা – ২ উঃ * ৭ সোঃ, ৭ উঃ, ৩ সোঃ, ৩ উঃ*। কেবল তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুর মতই বুনে গিয়ে শেষে ১ সোঃ।

৩২শ কাঁটা – সব উল্টো।

৩৩শ কাঁটা – ১ উঃ, * ৮ সোঃ, ৮ উঃ, ২ সোঃ, ২ উঃ,* একইভাবে তারকা-চিহ্নিত অংশটুকুর পুনরাবৃত্তি।

৩৪শ কাঁটা – সব উল্টো।

৩৫ শ কাঁটা – ৯ সোঃ, ৯ উঃ, ১ সোঃ, ১ উঃ। এভাবে গোটা কাঁটা।

৩৬শ কাঁটা – সব উল্টো। এই কাঁটায় ডিজাইন শেষ হল। এবারে এইভাবে আবার ডিজাইন শুরু করুন। ২০ ইঞ্চি বুনে বগলের ঘর ফেলুন এইভাবে –

পিছনের খণ্ডের ডানদিকের প্রথমে সোজা কাঁটার আরম্ভে ৩টে ঘর বন্ধ করুন ও বাঁদিকের ধারে উল্টো কাঁটার আরম্ভে ৩টে ঘর বন্ধ করুন। তারপর প্রত্যেক সোজা কাঁটায় প্রথমে ও শেষে একটা করে জোড়া বুনুন। প্রথম জোড়া অর্থাৎ দুটো ঘরকে একসঙ্গে নিয়ে সাধারণভাবে যেমনভাবে সোজা বোনা হয় সেইভাবেই বোনা হবে আর শেষের জোড়া অর্থাৎ ধারের ঘরদুটোকে একসঙ্গে বোনা হবে ঘরের পেছনদিকে কাঁটা ঢুকিয়ে। উল্টো কাঁটায় কোনো কমানো-বাড়ানো করতে হবে না। অর্থাৎ সোজা কাঁটাতেই দুটো করে ঘর কমে যাবে। এভাবে ৭ ইঞ্চি বোনার পর কাঁটায় থাকবে ২৮ ঘর। আর কমবে ৬২+৬ = ৬৮ ঘর। এখন যদি আপনার বোনা টাইট বা আঁটসাঁট হয় তবে ৭ ইঞ্চি বোনার জন্য ২৮-এর বদলে দু-একটা ঘর কমও থাকতে পারে। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এবারে অন্য একটা কাঁটায় ওই ঘরগুলি তুলে রেখে দিন। পিছনের খণ্ড শেষ হল।

সামনের দুটি খণ্ডে ৫৫ করে ঘর তুলে দুদিকেই বর্ডার বুনে ডিজাইন করে যান পিছনের খণ্ডের মত করেই। ঠিক ওইভাবেই ২০ ইঞ্চি বোনার পর বগলের ঘর ফেলতে হবে। কেবল এবারে ঠিক বগলের ঘর ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই গলার দিকে কিছুদূর অন্তর অন্তর ১ টা করে ঘরও বন্ধ করতে হবে। প্রথম ঘরটি ফেলা হবে ঠিক বগলের ঘর ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ওই একই কাঁটায়। এরপর ২-৩ কাঁটা পরপর একটা করে ঘর বন্ধ করতে হবে গলার জন্য। ঠিক যেমন সোয়েটারে V (ভি) গলার জন্য করা হয়। আর গলাফেলা আরম্ভ করার সময়, আবার বগলের জন্য ঘর ফেলা আরম্ভ করার সময়ও অবশ্য একটু সচেতন থাকতে হবে –যাতে একই দিকে না হয়ে যায়। কারণ প্রথম দিকে দু'খণ্ডই একরকম থাকে। কিন্তু বগল আর গলা ফেলা হবে বিপরীত দিকে। না হলে আবার খাটুনি বেড়ে যাবে। গলা এবং বগলের ঘর বন্ধ করতে হবে এমনভাবে যাতে ৭ ইঞ্চি বোনার মধ্যেই সব ঘর বন্ধ হয় আবার কমও না পড়ে। শেষে যখন কাঁটায় ১টা করে ঘর থাকবে সেটিকেও সেফটিপিনে তুলে রাখতে হবে।

এবারে হাতের জন্য ৫২ করে ঘর তুলে, ১০ নং কাঁটায় বুক-পিঠের মতই বর্ডার বুনুন। তারপর ১ ইঞ্চি পরপর দুদিকে ১টা করে ঘর বাড়িয়ে যান। ঘর ৭৮টা হলে তখন ছেড়ে দিন। তারপর মোট ঝুল যতক্ষণ না ১৯ ইঞ্চি হয় ততক্ষণ বুনে যান। ১৯ ইঞ্চি বোনার পর বগলের জন্য দুদিকে প্রথমে ৩টে করে ৬টা ও পরে দুধারে প্রত্যেক সোজা কাঁটার শুরুতে ও শেষে একটা করে অর্থাৎ ২টো ঘর বন্ধ করে যান। এভাবে আবার ৭ ইঞ্চি বোনা হয়ে গেলে কাঁটার যে কটা ঘর থাকবে অন্য কাঁটায় তুলে রাখুন।

এবারের কাজটাই একটু ঝামেলার। প্রথমে ডানদিকের বুকের খণ্ড, তারপর ডানদিকের হাত, তারপর পিছনের ভাগ, তারপর বাঁদিকের হাত, তারপর বাঁদিকের বুকের ভাগ পরপর সাজিয়ে নিন। এবারে ১০ নং কাঁটা নিয়ে ডানদিকের বুকের ভাগের তলার দিক থেকে ঘর তুলতে আরম্ভ করুন। বুকের ভাগের একেবারে ধার থেকে ঘর তুলুন। এটাকরতে হবে বোতামপটি ও গলার বর্ডারের জন্য। এখানে সব একসঙ্গে করা হয়েছে।তাই অনেক ঘর হবে বলে একটু ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বুকের ডানদিকের ভাগ, ডানহাত, ডান-দিকের গলা থেকে একসঙ্গে ঘর তোলা হবে। আর বাঁদিকের বুকের ভাগ, বাঁ হাত পিছনের ভাগকে একসঙ্গে করে তোলা হয়েছে। প্রথমে ডানদিকের ভাগে ১৩৫ ঘর তোলা হবে। যার মধ্যে বুকের খণ্ডে কাঁধের ওপরে ১টা ঘর আর হাতেরও তুলে রাখা ঘরগুলি আছে হিসেবে। তাহলে তলার দিকে ঘর তুলতে আরম্ভ করে ৮৭টা ঘর তুলুন গলা পর্যন্ত। তারপর গলা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ৩৫টা ঘর তুলুন। কাঁধের সেফটিপিনে তোলা ঘরটিও কাঁটায় তুলে নিন। তারপর হাতের ঘরগুলি তুলে নিন। হাতে ১২টা ঘর থাকবে। এবারে একসঙ্গে বুনে যান। যেমনভাবে বুক-পিঠে বর্ডার করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে। তারপর একটু টেনে ঘর বন্ধ করে দিন। এবারে বাঁদিকের ভাগেও ওই একইভাবে ঘর তোলা হবে, কেবল পিঠের ২৮ ঘরও ওইসঙ্গেই তুলে নিতে হবে কাঁটায়। এবারে একটা কাঁটায় সব ঘর একসঙ্গে করে একইসঙ্গে বুনে যান। এভাগে তাহলে হল ১৬৩ ঘর। আর দুদিকেই নিচের দিকের প্রথমের ঘরটা না বুনে তুলে নেবেন – তাহলে ধারটা সমান হবে।

বাঁদিকের ভাগে আরও একটা কাজ করতে হবে, তা হল বোতাম ঘর করা। এই বোতাম ঘর হবে তলার দিকে একটু ছেড়ে একটা, ঠিক গলার শুরুতে একটা আর মাঝখানের ৩টে অথবা ৪টে একটু হিসেব করে নিতে হবে। তবে সমান দূরত্বে হওয়া চাই। বোতাম ঘর করার নিয়ম হল –

যখন বর্ডারের ৩টে লাইন হয়ে যাবে তখন একই কাঁটায় ঠিক বোতাম ঘরের জায়গায় ২টো করে ঘর কাঁটায় বন্ধ করে করে যাবেন। পরের কাঁটায় ওই জায়গায় এসে কাঁটায় দুটো করে ঘর তুলে নেবেন। এই ঘর তোলা যেমন বোনার শুরুতে ঘর তোলা হয় সেইভাবে হবে। তাহলেই ওই জায়গায় গর্ত হয়ে থাকবে। এবার সব খণ্ডগুলি সেলাই করে জুড়ে নিন। গলার বর্ডারটা অবশ্য হাতের সেলাইয়ের সঙ্গে সুন্দর করে মিলিয়ে দিন যাতে বোঝা না যায়।

এবারে বোতাম বসিয়ে নিন। এটাই শেষ কাজ। তবে একটু ইস্ত্রি করে নেওয়াও ভাল সবশেষে। তাহলে বেশ ভাল হয়। এই কার্ডিগানটির হাতের কাটকে র‍্যাগল্যান কাট বলে। এটি সাধারণ ভাবে যেমন হাতের কাট করা হয় তেমন নয়। গলার ব্যাপারেও একটু অন্যরকম করতে পারেন ইচ্ছে হলে। গলার জন্য কোনো ঘর না ফেলে সোজা বুনতে পারেন। তারপর যখন বোতামপটি ও গলার বর্ডারের জন্য ঘর তুলে বোনা আরম্ভ করবেন তখন সেই বর্ডারটি একটু বেশি করে বুনলেই পরে গলার দিকে উল্টিয়ে ভাঁজ করে কলার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তফাত এটুকুই।

পুতুল খান্না

শ্বেতকরবী



সত্যেন্দ্র আচার্য

একটা শব্দ রেখে শালিকটা উড়ে গেল কিন্তু একটা পালক খসিয়ে অন্তত এক আনন্দের উপকরণ রেখে গেল সে। দাদা, পালক, লালি ঘাড় তুলে তাকিয়ে বলল, ওই শালিকটা রেখে গেল।

দেখি? সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েই হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিল সুমন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পালকটা নিল। লালির কাঁধে চটের ঝুলনো ব্যাগ, স্কুলের বন্ধুরা নিচে তাড়া দিচ্ছিল। লালি আর না দাঁড়িয়ে শুধু বলল, টেবিলে রেখে দেবে কিন্তু। ভীষণ দরকারি ওটা।

লালি চলে গেলে সুমনের মনে হল, এক রাত্তিরে অন্তত একটা স্বপ্ন দেখেছিল সে। এক রাজপুত্র ঝরনার পাশে বসে আছে। মাথার ওপর জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছিল। শুভ্র একটা রাজহাঁস ঝরনা থেকে উঠে এসে তাকে একটা পালক দিয়ে গেল। তলোয়ার হাতে রাজপুত্র পালকের ওপর দাঁড়াতেই পালক বাতাসে ভাসল। ভাসতে ভাসতে, দূরে এক ভিনদেশে এসে থামল। ভিনদেশের রাজকুমারী তাকে বরণ করল প্রথমে তারপর হাত ধরে নিয়ে গেল অন্তঃপুরে। ঘুমের ভেতর, স্বপ্নের ভেতর সুমন দেখেছিল রাজকুমারীকে।

সেই স্বপ্নের রেশ মাঝে মাঝে এখনো কেমন অনুভব করে সুমন। এই স্বপ্নের কথা সুমন আলাপের পর থেকেই বহুবার শুনিয়েছে নীলাকে। কিন্তু প্রথম বলার দিনটাকে সেই স্বপ্নের পালকের মতই সুমন মনে রেখেছে এখনো।

নীলা হাঁটছিল অনেকখানি দূরত্ব রেখে। সুমন বলেছিল, আচ্ছা, এখন যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে?

নীলা মাথা তুলছিল না। জবাব দিচ্ছিল না।

এখনো লোকের চোখে আমরা ছোট, কী বল, অ্যাঁ? সুমন কথা পাচ্ছিল না খুঁজে। দুটো মাস পরেই স্কুলের চৌকাঠ পার হয়ে আমরা বড় হয়ে যাব। কী বল অ্যাঁ? সুমন তাকিয়েছিল।

নীলা দাঁড়িয়ে পড়লে সুমনও হাঁটছিল না। কী, তুমি কথা বলছ না যে? সুমন বলল, বাড়িতে কিন্তু প্রথমদিন তুমি আমাকে খুব লাজুক ভেবেছিলে।

এই, তোমাদের অঙ্কের স্যার তোমাকে দেখে গেল।

নাকি?

হ্যাঁ। ওই রিকশায়। নীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনে দেখাল।

সুমন পৌরুষদীপ্ত উত্তর দিয়েছিল, ডোণ্ট কেয়ার। আমরা তো এখন অঙ্কের ক্লাসে বসে নেই?

এইবার চল ফিরি। ঠিক থামল না নীলা, তবে গতি অনেক শ্লথ করে বলল।

বিনা প্রতিবাদে আবার দুজনে ছাড়াছাড়ি। যাবার মুখে নীলা চোখ তুলে একটু হাসলে ঠিক তখনি সুমন ওই স্বপ্নের কথা, ওই পালকের গল্পটা বলেছিল। জানো, এক রাজপুত্র একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম একটা পালক পেয়েছিল—

এবার জুতোর ফিতে এঁটে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুমন। দেখল অদিতি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সুমনের মুখশ্রী অদিতির, আর অদিতির চোখ, রঙ, ঠোঁটের আদল সুমনের মত। যমজ ভাই বোন

দুজনে। অদিতি বড়, না সুমন বড় এই নিয়ে বন্ধুরা তর্ক করেছে অনেকদিন। অদিতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কিরে হাতে কি, প্রজাপতি ?

হু'।

ধরলি বুঝি ? ছেড়ে দে, কষ্ট দিস না। অদিতি চলে গেল।

বেশিরভাগ সময় অদিতি কথা বললে কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ছাব্বিশটা বসন্ত অক্লেশে পার করে এসে সংসারের স্থাবর-সম্পত্তির সঙ্গে এখন সে মিলে গেছে। রূপ তার আছে কিন্তু আগের সেই মনটা এখন আর বেঁচে নেই। থাকলে অত সাজতো না অদিতি।

একেক দিন বলে, তুই ঠিক প্রেমে পড়েছিস সুমন।

কি করে বুঝলি ?

একা একা ছাদে যাস। অদিতি হাসে। ঠিক হাসে না, হাসার ভান করে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছিস।

সুমন উত্তর দেয়, ধোৎ, ওসব কিছু নয়। ভাল লাগে, তাকাই। ছাদের ওপর থেকে বাড়িগুলো বড় ভাল লাগে আমার।

ভাল লাগে ? অদিতি অবাক গলায় বলে। তুই কবি। এবার হাসে। লিখিস তো ? তারপর বলে, আমিও তাকাই, কিন্তু কারোকে চোখে পড়ে না।

পড়ে না ? সুমন হাসে।

পড়ে।

তবে ? সুমন প্রশ্ন করে।

সে চোখ আমাকে টানে না। আবার দীর্ঘশ্বাস তোলে অদিতি।

সুমনের এক একসময় মনে হয় অদিতি বড় দুঃখী। ইদানীং মনে হয় অদিতির মুখের সব প্রসন্নতা উবে গিয়ে শুধু বেদনাটুকু বেঁচে আছে।

অদিতি চলে গেলে সুমন পালকটাকে ঘুরিয়ে একবার দেখল তারপর দু সিঁড়ি উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পালকটাকে ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমের দোতালার বারান্দায়।

দামী রোদ-চশমায় চোখ দুটো মুড়ে নীলা অনেক আগেই দাঁড়িয়েছিল। দেরি যে ? নীলা কপট অভিমান আনল গলায়।

সুমন বোকার মত হাসল।

চল চল। সুমন ওকে স্পর্শ করে বলল, সত্যি, তুমি রাগলে যা হয় !

কী হয় ? ওভারব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে নীলা বলল।

সুমন দু সিঁড়ি নেমে গলা তুলে হাসল। হেসে বলল, মনে হয় এখনি বুঝি দমকল ডাকতে হবে।

ট্রেন এসে গেল একটা। থামল। সবুজ আলোয় বাঁশি দিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে গেলে মানুষের ভিড়ের ভেতর ওরা মিশে গেল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে গেল কাফেটার সামনে। ব্যস্ততা দেখে সুমন বুঝল অফিসের ভিড়। ওরা কাফেটায় এসে বসল। নীলা রোদ-চশমা খুলল এবার। বসতে বসতে বলল, রোজ রোজ এই একই কাফে, কোন বৈচিত্র্য নেই তোমার। বালিগঞ্জে আর কোন কেবিন নেই বুঝি ?

আছে। অনেক দাম। সময় কাটাব আমরা, সস্তা দরের হলেই তো ভাল। সুমন বলল।

নীলা একটু লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বলল, সেটা ঠিক।

সুমন গলা বাড়িয়ে বয়কে বলল, কফি দু কাপ। তারপর গলাটা পর্দার ভেতর টেনে এনে বলল, চা কফি খেয়ে খেয়ে আর ভাল লাগে না। অন্য কিছু খাবে ? কোল্ডড্রিংক কিংবা আর কিছু ?

আরে না না। নীলা বাধা দিল।

সুমন এবার স্বাভাবিক হল। একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে বলল, আসি যাই, দেখা হয় তোমার সঙ্গে, আজেবাজে কথায় সময়টুকু ফুরিয়ে যায়। একটা ঢোক গিলল সুমন, কাজের কথা কিছুই আর বলা হয় না।

নীলা কফিতে চুমুক দিল। এই দীর্ঘদিন তোমাকে দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, নতুন করে আর কি বলার আছে। বল না ? টেবিলের এপার থেকে ওকে ছুঁ'ল হাত বাড়িয়ে। কী, কথা বলছ না কেন ?

সুমন ধোঁয়া ছাড়ল সিগারেটের। তাকাল। আচ্ছা, কতদিন হল বলত ?

তা তো হলই। নীলাও তাকাল। হাসল। রসিকতা করল নীলা, স্কুল থেকেই তো পেকে গেছি।

সে তো ছ' বছর আগে। সুমন এবার ভরাট গলায় বলল, ভীষণ ভয় করে একেক সময়।

কেন ? নীলা কফির ঢোক গিলল। কিসের আবার ভয় ?

যদি পচা বলে বাতিল হয়ে যাই ?

ওহো ! নীলা এবার জোরে হেসে ফেলল। সুমনও গলা মেলাল। হলেই বা, নীলা আবার রসিকতা করল, অত কিসের ভয়, পুরুষ মানুষ তো ?

তোমার কোন ভয় নেই। সুমন বলল, মেয়েরা পাকেও না, পচেও না। চিরদিন কচিকাঁচা।

নীলা একটু থতমত খেল। একটু ইতস্তত করে বলল, থাক থাক, ওসব পাকাপাকির কথা থাক, অন্য কিছু বল, নয়তো এস সেই কাঁচাবেলার কথা আবার নতুন করে ভাবি। আচ্ছা, পুরনো দিন, পুরনো কথা, পুরনো স্মৃতি বিশেষ করে ছেলেবেলা, স্কুলের দিন এসবের ভেতর কেমন একটা চার্ম আছে, না ? নীলা খুশি গলায় বলল, বেশ রোমান্টিক তাই না ?

রিয়েলি। তোমাকে দেখলেই তো পেছনের দিনগুলো আমার মনে পড়ে। সুমন বলল, হেড মাস্টারমশাই বেত মারছেন, হাত পেতে আছি আমি, এইসব।

নীলা খপ করে হাত টেনে নিল সুমনের। আহা ! সুমনের হাতের তালুতে নিজের হাত রেখে ঘষল। বলল, সত্যি, আমার খুব কষ্ট হয় এখনও মনে হলে। মারটা তুমি আমার জন্যেই খেয়েছিলে।

মার কি এখনো কম খাচ্ছি ? সুমন এবার ওর হাত নিজের মুঠোয় নিল। বলল, তুমি আর এসবের জ্বালা কী বুঝবে ? সুমন বলল, একদিন তোমাকে আমি অ্যাইসা মারব না ? মুখটা সুঁচলো করে বলল, গা গতরের ব্যাথা মরতে দেখবে কী রকম সময় লাগছে।

নীলা কিন্তু প্রসঙ্গটাকে জিইয়ে রাখল। সেই তোমার হেড মাস্টারমশাই এখন আমাদের এই কেবিনের ভেতর কফি খাচ্ছি দেখলে কী ভাববে বলত ?

সুমন একটু অবাক হয়ে মাথা তুলল। কী আর ভাববে ? বলল, স্কুল ডিঙিয়ে যখন এতদূর চলে এসেছি, ভাববে, ওদের জীবন এখন বাঁধা হয়ে গেছে। তাই না ?

নীলা কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে তাকাল। বলল, বেশ গরম পড়ে গেছে না ?

সুমনের এখন আরো কাছের হতে ইচ্ছা হল। হাত বাড়িয়ে টেবিলের এপার থেকে ওকে ছুঁ'ল। আঙুল কটা কখনো শক্ত করে ধরল, কখনো আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করল। নীলা আপত্তি করছিল না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে মেলামেশার ভেতর ওই পর্যন্ত। অনেক কথা বলে ওরা। বয়েস হলেও বুঝতে চায় না। অন্তত সুমন। কেন জানি, হয়ত বা অকাজের বলে, বেকার বলে কেমন একটা সংকোচ অনুভব করে সময় সময়। সুমন খুব ছেলেমানুষের মত এবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা নীলা, এই যে তোমার আমার দেখা হয়, দিনের পর দিন না দেখলে আমার কেমন কষ্ট হয়। তোমার এমন হয় ?



বোঝ না ?

না।

নইলে আসি কেন ?

সুমন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর বলল, মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যেন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছ। সুমন এবার হাত ধরে নীলাকে একটা আলতো ঝাঁকানি দিল।

এসব কী বলছ ? নীলা বাধা দিল। সুমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। এই ওঠো, বেলা হয়ে গেছে। বারোটা।

নীলা উঠে দাঁড়াল। নিজের ব্যাগ, খাতা, রোদ-চশমা হাতে নিয়ে হাসল, বারোটা ? টেবিল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বলল, বারোটাকে অত ভয় পাও কেন ? নীলা ওকে এবার রাগাবার চেষ্টা করল। অন্তত তোমার সঙ্গে যখন ঘুরছি, হৃদয়চর্চা করছি তখন তো বারোটা আমার বাজবেই।

দুপুরে কী করবে তুমি ? লিখবে ? নীলা বলল।

[illegible] লেখা। চেষ্টা করি এই পর্যন্ত। তুমি আমাকে খুব একটা ব[illegible] ভাব, না ?

ব[illegible]গেছে ভাবতে। নীলা অস্পষ্ট বলল। তবে একেবারে যে কিছু ভাবি না, তাও নয়।

হঠাৎ ? আমার সম্বন্ধে এত ভাবনা তোমার ?

দেখ, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি পারব না। নীলা জবাব দিল। তোমার মত অত যোগ্যতা আমার নেই।

সেকি ? অভিযোগটা আমারই হওয়া উচিত ছিল। সুমন ওকে দেখল।

নীলা জোরে হাসল। একটা বাস এল, দাঁড়াল না।

সুমনের কি একটা কথায় এবারে দুজনে এমনভাবে গলা মিলিয়ে হাসল যে স্টপের অনেকেই চোখ তুলে দেখল। তখনো ওরা হেসে চলেছে।

বাস থামল এবার। নীলা উঠল। উঠেও মুখ বাড়িয়ে সুমনকে দেখল। সুমন আঙুলের ফাঁকে সিগারেট চেপে হাত নাড়াল। তারপর বাসটা ছেড়ে দিলে ও হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, ঠিক আজ থেকে ছ'টা বছর আগে, কী ভয় ছিল সুমনের। দুজনে যেদিন প্রথম হেঁটেছিল, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল যেন। অথচ আজ ?

সেদিনের কথা মনে হলে, মনে পড়ে যায় হেড মাস্টারমশাইকে। গোলগাল বেঁটে মানুষটি, কাঁচাপাকা গোঁফ, একটু মোটা, গায়ের রঙটা একটু চাপা। কপালের ওপর বলিরেখা স্পষ্ট, সিগারেট খেতেন ঘন ঘন। ক্লাসে ঢুকে হেঁকে ছিলেন, সুমন ব্যানার্জি, মনিটার সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়—সুমন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

চিবিয়ে চিবিয়ে হেড মাস্টারমশাই বলেছিলেন, লাস্ট বেঞ্চে কেন ?

সুমন চুপ।

ইউ আর টু এক্সপ্লেন। হেড মাস্টারমশাই গর্জালেন।

তোমার অধোগতির আরো সংবাদ আমার টেবিলে আছে। হেড মাস্টারমশাই দরজার বাইরে এসে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। এই পিরিয়ড শেষ হলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সি মি আফটার দিস ক্লাস।

সুমন কাঁপছিল। লেট-এ আসায় প্রথম বেঞ্চে জায়গা হয়নি তার একথা বলার সাহস হয়নি। অঙ্কের মাস্টার দরজার বাইরে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। হেড স্যার বেরিয়ে গেলে বিনয় স্যার ঢুকলেন। খুব শান্ত গলায় বললেন, সুমন কী হয়েছে রে ?

সুমন ভাবছিল। কী হয়েছে তা সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই বলল, কিছু তো হয়নি স্যার।

অঙ্কের খাতা দে। হোম টাস্ক।

সুমন মাথা হেঁট করে বলল, কাল স্যার আমি আসিনি। বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম।

বেঞ্চের ওপর দাঁড়া।

সারা ঘর নিঃস্তব্ধ। সুমনের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। বেঞ্চের ওপর উঠে এবার কেঁদে ফেলল।

নীলাকে ছেড়ে দিয়ে সুমন রোদের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে এসব ভাবছিল। ভাবতে ভাল লাগছিল। স্মৃতি আনন্দ দিচ্ছিল। প্রখর রোদ মাথার ওপর। কপালের ওপর ঘামের বিন্দু জমেছে সুমনের। প্লাটফরম দিয়ে সোজা হেঁটে লাইন ধরল সুমন। লাইন তেতেছে। তাত ঠিকরে পড়ছে। মাথা হেঁট করে হাঁটতে হাঁটতে আবার মনে পড়ল।—আরো একদিন ডেকেছিলেন হেড মাস্টারমশাই। তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসরের আগের দিন। নিভৃতে সুমন ঘরের ভেতর ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়ালে হেড স্যার বলেছিলেন, সুমন এই যে বেত। সুমন অবাক হয়েছিল।

মাথার ওপর পাখা ঘুরছিল। হেড স্যারের কয়েকটা চুল কপালের ওপর এসে পড়েছিল। উড়ছিল। হেড স্যার সুমনের চোখের ভেতর তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছিলেন। তারপর একসময় আরো কাছে সরে এসে বললেন, নে, ধর।

সুমন তাকাতে পারছিল না। কী ঘটছে, ঘটে যাচ্ছে সুমন তা বুঝতে পারছিল না। এবার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, আমি জানি রে, তুই করবি না।

সুমন তবু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। জানিস বোধহয়, কাল আমি চলে যাব।

চোখ তুলে এতক্ষণ পরে তাকাল সুমন।

আজ আমার চাকরির শেষ দিন।

জানি স্যার। সুমন এতক্ষণ পরে কথা বলল।

তোরাও যাবি। আর তো মোটে দুটো মাস। কিন্তু যাবার আগে তোকে কেন ডাকলাম জানিস ?

সুমন তবু কিছু বুঝতে পারছিল না। হেড মাস্টারমশাই বললেন, সেদিন হেড মিস্ট্রেস কমপ্লেন পাঠিয়েছিলেন, সুমন নামের একজন ছাত্র এই ক্লাসের একটি মেয়েকে আম ছুঁড়ে দিয়েছিল ক্লাসের ভেতর। হেড মাস্টারমশাই আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অভিযোগটা আমার টেবিল থেকে চলে গেল স্টাফ রুমে। আর আমি ? যেন নাটকের কোন চরিত্রের মত করে বললেন,—আমি অনন্যোপায় হয়ে তোকে ডেকে এনে বেত মারলাম। গলার স্বর যেন বুজে আসছিল হেড স্যারের। বললেন, তোর ওপর আমার অনেক আশা যে রে সুমন !

সুমন খুব নিচু গলায় অস্পষ্ট বলেছিল, আপনি বসুন স্যার।

হেড মাস্টারমশাই এবার বসলেন। টেবিলের ওপর মাথা রেখে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, তার কিছুদিন পরে একটা মেয়ে এসে

আমায় বললে, আমিই সে। কে? আমি বললাম। যাকে লক্ষ্য করে আম ছোঁড়া হয়েছিল। তারপর জানলাম, সেই সুমন তুই নয়, রোল টেন। আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন হেড মাস্টারমশাই। নে, আমাকে মার। প্রতিশোধ নে। কেউ নেই এখানে। কেউ জানবে না।

সুমনের চোখে সেদিন আর একবার জলধারা নেমে এসেছিল। সুমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

কাল আমি চলে যাব। সব স্মৃতি, তোদের মুখশ্রী, প্রতিটি দিনের ঘটনা, সুখ, সুনাম সব পড়ে থাকবে। কিন্তু নিষ্পাপ যে ছেলেটির প্রতি আমি ভুল করেছি, তার কথা মনে হলে আমি শান্তি পাব না। ধর।

দুই

অদিতি বেরিয়েছিল স্কুলে কিন্তু পৌঁছে শুনল এক পিরিয়ড হয়েই ছুটি। রামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন। বাড়িতে ফিরে এল একটার কাছাকাছি। ভেবেছিল সিনেমায় যাবে কিন্তু ইচ্ছা হল না। বিশেষ করে স্কুলের যারা কলিগ, অদিতি বাধ্য হয়েই তাদের সঙ্গে হাসে, কথা বলে, চা খায় কিন্তু এর বেশি সঙ্গ দিতে নারাজ। তাই ফিরে এল, ফিরে এসে স্কুলের শাড়ি পালটাল। দেখতে দেখতে বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গেল।

দুপুর ঠিক নয়, তবু সূর্যের দিকে তাকাল একবার। বর্ষার মেঘ কিছুদিন আগেও আকাশকে ছুঁয়ে থাকত। শরতের দেরি নেই বলে না কি, না মেঘ না রোদের আকাশে তাকালে দুপুর কি বিকেল ঠিক বোঝা যায় না। স্কুলে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে শরীরে, বিশেষ করে যখন মনে হয় এগারজন শিক্ষিকার ভেতর সে শুধু কুমারী। অঞ্জনাদিও এই সেদিন দুম করে বিয়ে করে বসল।

একটা দীর্ঘশ্বাস তুলে অদিতি এখন বুঝল, না, ছুটি হয়ে ভালই হয়েছে। যতক্ষণ অন্তত ওই সঙ্গ থেকে দূরে থাকা যায় ততক্ষণ। একটু সুস্থ থাকা যায়। এই স্কুলটার কথা মনে হলে অদিতির পেটের ভেতর থেকে গলার কাছ পর্যন্ত একটা বমির ভাব যেন পাক খেয়ে ওঠে। প্রতিদিনের জন্য এটাই যেন বরাদ্দ। কতকগুলো বিবাহিত মেয়ে একজোট হয়ে পড়ানোর নামে কাঁচকলা, শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা। অথচ উপায় নেই, সুস্থ মন নিয়ে এই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার অন্য কোন উপায় নেই। অদিতির এখন মনে হল, ছুটি হলেও এতক্ষণে সেই চার দেওয়ালের ভেতর পরচর্চার জমাট আসর ভাঙেনি। যাক, তবু তো রেহাই পেলাম আজ।

কয়েক সিঁড়ি নিচে নেমে এল অদিতি। উঁকি দিয়ে দেখল সুমন লিখতে বসেছে। আবার উঠে এল অদিতি। দোতলার কোণের ঘরে লালি গাইতে বসেছে। মাস্টার এসেছে। দুদিন পরে নাকি রেডিওতে অডিশান। স্কুল থেকে ফিরেই দিনরাত গুনগুন করছে। হাহা করছে। তানপুরার কান টিপছে, চিমটি কাটছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিতে আর মাত্র কটা মাস দেরি কিন্তু পড়ার চাইতে গানেই ওর আগ্রহ। অদিতি কিছু বলে না। সুমনও। অন্তত যতক্ষণ হাসিখুশির ভেতর থাকে। *সেই যন্ত্রণাটা থেকে দূরে থাকতে পারে অন্তত।*

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে চমক ভাঙল অদিতির। দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গিয়ে দেখল দরজায় ডাকপিওন দাঁড়িয়ে। চিঠি? অদিতি বলল।

রেজেস্ট্রি।

নাকি? অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল অদিতি। দিন। স্লিপে সই করে দিয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। চিঠিটা অদিতির বাবা লিখেছেন।

নিজের ঘরে উঠে এল অদিতি। বাবা যখন গত বছরে এখানে অনেক পীড়াপীড়িতে মেরে কেটে দিন দশেক ছিলেন তখন খবরের কাগজ দেখে দেখে পাত্র পক্ষকে চিঠি লিখতেন।

পাত্রপক্ষের চিঠি বেনারসের ঠিকানায় এলে এবং পাত্র সম্বন্ধে আস্থাবান হলে একটি চিঠি আসে কলকাতায়। কিন্তু চিঠিটা রেজেস্ট্রি দেখে অদিতি বিব্রত হল না। ছিঁড়ে ফেলল। চিঠিটা পড়ে যখন বুঝল আশঙ্কার কোন কারণ নেই তখন অদিতির চোখে মুখে খুশির ঝলক বয়ে গেল। অন্তত কোন পাত্র তাকে দেখতে আসার—এ চিঠি নয়। নিষ্কৃতি পেল অদিতি। কেউ তাকে দেখতে আসছে না।

কড়া নাড়ার শব্দে গান থামিয়েছিল লালি। মাস্টারমশাই চলে গেলে চুপিচুপি এ ঘরে ঢুকে খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে বসল, তোর হাতে কিরে দিদি, চিঠি?

হুঁ। অদিতি খুব নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল।

কার?

বল না কার। অদিতি টেবিলের ওপর এটাওটা গোছাল।

রঞ্জুদার। লালি এপাশ ওপাশ করল বিছানায়। হুঁ নিশ্চয়ই। কী ঠিক না? লালি তাকাল।

পারলি না তো? অদিতি হাসল। অঁাচলটা বুকে তুলল।

তবে ঠিক অনীশদার।

অদিতির এ মুহূর্তে রঞ্জন বা অনীশ কারো কথা মনে পড়ল না। পৃথিবী এবং স্বার্থপরতা এই দুটো শব্দ একাত্ম হয়ে অদিতির কণ্ঠনালী অসাড় করে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল অদিতি। না রঞ্জু, না অনীশ কারো কথা মনে হলো না। বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা বলতেন, জানিস অদিতি, এ পৃথিবীটা বড় স্বার্থপর, শুধু হিংসা আর ধুলোমাটি দিয়ে তৈরি। কিন্তু আমরা তো মানুষ। পৃথিবী মানুষের। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যোগ শুধু স্বার্থের? মানুষ যেমন পৃথিবীর কাছ থেকে নেয়, তেমনি পৃথিবীও তো আশা করে মানুষের কাছে কিছু। শুধু যদি সম্পর্ক হত স্বার্থের, নীচতার, ভেদাভেদের, তাহলে তো আমরা পশু। সত্যিকারের মানুষ হলাম কই?

লালি এতক্ষণ চুপ করে পড়েছিল বিছানায়। উপুড় হয়ে এবার শুয়ে একটু উঁচু হয়ে দু হাতের তালুর ওপর চিবুক রাখল। রেখে বলল, কাররে দিদি চিঠি? বাবার? খুব অবাক হল লালি। বলল, রেজেস্ট্রি কেন, কেউ আসবে?

না।

তবে? উৎসুক হয়ে তাকাল লালি।

জরুরী বলে।

জরুরী? কী ব্যাপার, বাবার শরীর ভাল তো?

শরীরের চেয়ে বাবার মন ভীষণ সতেজ। অদিতি ওর পাশের বিছানার ওপর বসে পড়ল। বাবার এই চিঠিতে কী লেখা আছে জানিস?

কী?

সেই দুর্লভ ফুলের কথা।

ফুল? অবাক গলায় প্রশ্ন করল লালি। কী ফুল?

দেখ। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিল অদিতি। দিতে দিতে বলল, এই বুদ্ধ পূর্ণিমায় সেই দুর্লভ ফুল 'স্টার অব বেথেলহেম' ফুটবে।

•

বাবা বলতেন রক্তের দোষ। বলতেন, সর্বত্র ত্রিবিধালোকাঃ, উত্তম-মধ্যমাধমাঃ। কিন্তু তাতে কি, উত্তম, মধ্যম কি অধম, সকলের ভেতর রক্ত আছে। তা বলে রক্তের জাত নেই?

চাঁদ-ফুল-তারা-শিশুর হাসি কে না ভালবাসে? কিন্তু আবার



বাসেও না, এমন লোকও তো পৃথিবীতে বিরল নয় ? জানি, আমাদের পূর্বপুরুষ ভালবাসতেন। লোকের মত তাঁরাও মানুষ ছিলেন কিন্তু সকলেই যে উত্তম ছিলেন, এমন তো নয়, কুলাঙ্গারও তো পৃথিবীতে জন্মায়। এই দেখ না, আমি ? বাবা হাসতেন। ভেদনীতি, বিষয়বুদ্ধি, প্রবঞ্চনা, এদের প্রিয়পাত্র হলে, তোরা এমনিভাবে পথে বসতিস ? সেদিক থেকে রঞ্জন ছেলেটি আমার চোখে লাগে খুব। হ্যাঁ রে, রঞ্জনদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিস তো ?

এই ফুলের জন্য বাবার যেমন নিজস্ব একটা পৌরুষ, একটা গর্ব আছে, তেমনি জমিদারির ওপর যেমন একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে বাবার। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সরল সাদাসিধে সৌখিন মানুষ, গান ভালবাসেন, বিলেতি চিত্রকরের ছবি, আর ফুল। ভীষণ ফুলের শখ বাবার।

রঞ্জনকে বাবার চোখে লাগত কেন, অদিতি অনেকদিন ভেবে দেখেছে কিন্তু তেমন কোন যোগ্য উত্তর খুঁজে পায়নি। অন্তত বাবা যখন কিছুদিন এখানে ছিলেন, তখন দেখেছেন অনেককেই, আগে থেকেও চিনতেন অনেককে। সুমনের সব বন্ধুদের সবাইকে সমান ভালবাসতেন তিনি। কিন্তু রঞ্জনের বেলায় মুখ ফুটে বলেছিলেন, রঞ্জনকে আমার চোখে লাগে খুব।

অথচ রঞ্জন ঠিক সাধারণ নয়। প্রচ্ছন্ন একটা গর্ববোধ আছে। সম্মানের সঙ্গে লেখাপড়ায় শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে বলে একটা প্রচ্ছন্ন অহমিকা আছে। চাকরি করে তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু বড় রকমের চেষ্টায় আছে। সেদিক থেকে রঞ্জন একটু আলাদা।

এতক্ষণ পরে অদিতি প্রশ্ন করল লালিকে। দিদিকে এতক্ষণ চুপচাপ করে বসে থাকতে দেখে লালি গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজছিল। অদিতি বলল, হ্যাঁ রে লালি ?

কি ? লালি তাকাল। গান থামাল।

যাবি নাকি ?

বেনারস ?

হ্যাঁ। তুই, আমি, সুমন ?

রঞ্জন, পরেশ, অনীশ ?

ফাজিল।

লালি হা হা করে হাসল। বিছানার ওপর গড়াগড়ি খেল। সকলে যাব। তারপর বলল, ফুলের এগজিবিশন কতই তো হয় কলকাতায়। লোক আসে না ? তেমনি সবাই মিলে যাব আমরা। সব্বাই।

কেন ?

নয়ত কি ? রাজভবনে, হর্টিকালচার গার্ডেনে লোকে যায় না ? লালি এবার কপট অভিমানের সুর আনল গলায়, তুমি খালি দোষ দেখ আমার। বেশ বাবা বেশ, তার চাইতে কারো গিয়ে দরকার নেই।

'পুনশ্চ' দিয়ে বাবা কী লিখেছেন দেখ। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল অদিতি।

খোলা চিঠিটা হাতে নিয়ে লালি সবটা পড়ে নিয়ে বলল, রঞ্জনদার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন তো। চাইবেনই।

অদিতি বলল, রঞ্জনের ঠিকানা আমার জানা নেই।

আমি জানি।

তুই লিখগে যা।

আমার কাছে তো চিঠি আসেনি ? লালি আবার হাসল, বলল, পিতৃআজ্ঞা পালন না করলে পাপে পড়বে। নরকে যেতে হবে।

পাপ ? অদিতি এবার একটু মুষড়ে পড়ল যেন। লালি হঠাৎ অবাক হয়ে তাকাতেই অদিতি আবার স্বাভাবিক হল। বলল, বাবা যখন লিখেছেন, তখন জানাব।

রঞ্জনের কথায় অদিতি জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল, রঞ্জনের কথায় এ ধরনের রাগ তার শোভা পায় না। রঞ্জন তো কোন ক্ষতি করেনি! আশ্চর্য একটা মেজাজের ছেলে বরং সে।

গতবারে বাবা যখন এ বাড়িতে দিন দশেক ছিলেন, রঞ্জন তখন রোজ এসেছে এ বাড়িতে। নানা কথায় বাবাকে সঙ্গ দিয়েছে, ভুলিয়ে রেখেছে। তবু রঞ্জন অদিতির চোখে কেমন ছোট হয়ে গেছে।

ঘটনাটা সামান্য। কিছুদিন থেকেই অদিতি লক্ষ্য করছিল সুমনের সঙ্গে কোথায় যেন বোঝাপড়ায় একটু ভুল হচ্ছে। একটা চাকরির জন্য খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সুমন দরখাস্ত করেছিল। রঞ্জনও। ইন্টারভিউর চিঠি এল দুজনের। দুজনেই তৈরি হল। কিন্তু দিনের দিন রঞ্জন ইন্টারভিউতে গেল না।

সুমন বসেছিল বিকেলে। রঞ্জন এল। মুখে সেই হাসি। কিন্তু সুমন কেমন গম্ভীর। রঞ্জনের চোখে সেই খুশি খুশি ভাব। সুমন জিজ্ঞাসা করল, কি, তুই যে গেলি না ইন্টারভিউতে ?

না।

কেন ? সুমনের কপাল কুঁচকে উঠেছিল।

এমনি। রঞ্জন মুখ বেঁকিয়ে বলল। তোর হোক চাকরিটা, আমি চাই।

দুজনে আর কোন কথা নেই। রঞ্জন বলল, অদিতি নেই ?

দেখ। ছোট্ট জবাব দিল সুমন।

রঞ্জন ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সুমন। তারপর অদিতির দিকে তাকিয়ে সুমন বলল, দেখ অদিতি, দুনিয়ার লোক তোকে কৃপা করতে পারে, ভালবাসে বলে। কিন্তু আমি তার অংশভাগী হতে গেলাম কেন ?

অদিতি কিছুই বুঝল না। শুধু দুজনকে দেখল। রঞ্জন বলল, এসব কথা আসছে কিসে ?

আসে। সুমন ঝাঁঝাল উত্তর দিল। কারণ অদিতিকে ঘিরে তোর স্বার্থ আছে বলে।

ঠিক বাকযুদ্ধ নয়, কিন্তু অদিতি বুঝেছিল, দুজন দুজনকে আক্রমণ করছে। কিন্তু রঞ্জনের মত ছেলে একসময় ভুল করে বসল। ফস করে বলল, তোদের জন্য অনেক করেছি সুমন, এখন ভদ্রতা পারিস, গলা দিয়ে নেমে গেছে তাই।

অদিতি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিছুই বুঝছিল না। শুধু শুনছিল। এরপর অদিতি উত্তর দিয়েছিল, উপকারীর উপকার স্বীকার করব না এমন অকৃতজ্ঞ আমরা নই। অদিতির সর্বাঙ্গ কেমন জ্বলছিল। তাই মাথা নিচু করে বলল উপকারগুলোর একটা লিস্ট দিও রঞ্জন, জীবনে আমি অন্তত পরিশোধ করবার চেষ্টা করব।

রঞ্জন থেমে গিয়েছিল। সেই থেকে রঞ্জন আসেনি আর এ বাড়িতে। কিন্তু চিঠি দিত কালেভদ্রে। শেষ চিঠি এসেছিল বৈশাখে।

—এখন এলাহাবাদে আছি। আমাদের কোম্পানির এখানে একটা সাব অফিস আছে। আমি জোনাল ম্যানেজার। এখান থেকে বেনারস কী এমন দূর? অফিস আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে। অদিতি, তোমরা বেনারসে এলে জানিও। গাড়ি পাঠাব। তুমি, সুমন, লালি না হয় ঘুরেই গেলে। এখান থেকে চিত্রকূট যেতে হয়। মেসোমশাইকে সঙ্গে নিয়ে না হয় ঘুরে আসব সকলে মিলে?

লালি এতক্ষণ খোলা চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বাবার হাতের লেখার তারিফ করল। এই বয়েসেও কী সুন্দর হাতের লেখা না?

হ্যাঁ। অদিতি একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বলল।

লালি বলল, ফুলটার নাম কি বল ত দিদি?

যেন লালির প্রশ্নের কাছে অদিতি পরীক্ষা দিল। বলল, স্টার অব বেথেলহেম।

তিন

হঠাৎ যেন কোথা থেকে মেঘের দুরন্ত মিছিল পরিষ্কার আকাশটাকে ঘেরাও করল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এল, পরে জোরে নামল। একটু আগেও হাওয়া ছিল, গুমোটভাব কেটে গেল এখন। পাখার হাওয়া তেমন ভাল লাগছিল না। হাত বাড়িয়ে রেগুলেটার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অদিতি আস্তে করে দিচ্ছিল পাখাটাকে। ঘরে ঢুকল সুমন। উঁহু কম না, কম না, ফুলস্পীড।

স্পীড বাড়াল অদিতি। কী হল অত গরম যে!

হবে না?' সুমন হাসল।

কারণ? অদিতিও হাসির রেখা ঠোঁটের ওপর রাখল।

আছে বৈকি।

ব্যাপার কি; এমন অসময়ে?

সুমন ড্রয়ার খুলে মানিব্যাগ, কলমটা রাখল। হাতঘড়িটা খুলল। অদিতি তাকাল এবার।

বৃষ্টি আরো জোরে এসেছে। কড়কড় শব্দ করে একটা বাজ পড়লে সুমন কানে আঙুল দিল। ওহ! সুমন অস্ফুটভাবে শব্দ করল গলায়। ওই বিকট শব্দ-টব্দ আমার ভাল লাগে না।

বৃষ্টির ছাট আসছিল। অদিতি উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে জানলাটা টেনে দিল। টানতে গিয়ে দেখল বাইরেটা। অনেকদিন পর এই প্রথম বৃষ্টি নামল। রাস্তায় জল জমেনি এখনো। কিন্তু পাশের বাড়ির একটা বাচ্চা হাঁকছে, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে। অদিতি দেখল বাচ্চাটা হাত বাড়িয়ে জানলা দিয়ে বৃষ্টির জলে হাত ভেজাচ্ছে। অনেকক্ষণ দেখে ঘরের ভেতর তাকিয়ে বলল, চা খাবি?

শুধু চা। সুমন ছেলেমানুষের মত বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে কিন্তু। কিছু সেই?

রুটি খাবি?

ধ্যেৎ খালি রুটি। কিছু কর না। ডিম নেই?

আছে।

হালুয়া বানা। ওমলেট-টোমলেট নয় কিন্তু। তারপর নিজের মনেই বলল, তেল তো নয়, শেয়ালকাঁটার বীজ খেয়ে খেয়ে শালা পেটের ভেতর হয়ত একটা গাছই হয়ে গেল। মানুষের শরীর তো বটে!

শরীরের ওপর বেজায় লক্ষ্য দেখি এখন? অদিতি বলল, অথচ স্নান খাওয়ার তো সময় নেই। কী অত রাজকার্য শুনি?

সুমন হাসল গলা তুলে। আচ্ছা বাবা, যা তোমার খুশি তাই করে ফেল। বলতে বলতে জামাটা খুলল সুমন। লালি নেই? ওকেই না হয় অর্ডার করে দাও না। যেন নিজের মনেই কথাগুলো বলল সুমন। এবার জামাটা হ্যাঙারে ঝোলাল।



নেই। অদিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল। ও আর থাকে কতক্ষণ? গান গান করে পাগল। তারপর একটু থেমে বলল, পাগলই হওয়া যায়, গাইয়ে হওয়া যায় না।

কেন? গেঞ্জির দিকে তাকিয়ে সুমন বলল, গেঞ্জিটা কাল ধুয়ে দিতে বলিস তো বামনদিকে। হয় না কেন? সুমন বলল।

এই কাঠামোতে হয় না। সাধ, সাধনা, সাধ্য তিনজনের সঙ্গে সমঝোতা চাই। তিনজনের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব রাখতে হয়। বেরিয়ে যেতে যেতে অদিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সব সাধ সকলের পূরণ হয় নাকি? সাধনাও লোক চিনে চিনে কৃপা করে।

অদিতি চলে গেলে জানলাটা সুমন খুলে দিল। বৃষ্টির ছাট আর কিন্তু কমেনি। গলির মুখে একটা মরাগোছের গাছ। কি গাছ কেউ জানে না। গাছটাকে চিনতে যে লক্ষণগুলো দরকার তা সুমনের কোনদিন চোখে পড়েনি। গাছটা ভিজছে।'

একটা লোক কিন্তু বেমালুম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সুমনের হঠাৎ মনে পড়ল, বেশ কয়েক বছর পেছনের একটা দৃশ্যকে।—সুমন দাঁড়িয়েছিল ওমনি মাথা বাঁচিয়ে একটা গাছের নিচে ঢাকুরিয়া লেকে। মাথায় একটা রুমাল। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে তখন। সিগারেট ঠিক তখনো ধরেনি তবে দু-একটা চলে সময় সময়ে। দেশলাইয়ের বারুদ ভিজে গিয়ে কাঠিটা জ্বলছে না। অন্তত গোটাদশেক কাঠির পর শেষ কাঠিটা যখন জ্বলল, নীলা তখন পেছনে এসে দাঁড়াল।

ভাবলাম ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিই। নীলা এবার সামনে এল। কিন্তু তোমার কষ্ট হবে ভেবে দিলাম না।

নীলাকে দেখে কাঠিটা মুখে তুলতে ভুলে গেল সুমন। কাঠি নিবে গেলে সুমন বলল, তুমি একেবারে ভিজে গেছ।

কাকভেজা হয়েছে নীলা।

এত বৃষ্টিতে না ভিজলেই পারতে। সুমন খুব লজ্জা পেল। এখন যদি তোমার কিছু হয়। জ্বরটর, গলাব্যাথা?

তাহলে হয়ত তোমার লজ্জা ভাঙবে। একবার হয়ত বাড়িতে যাবে।

সুমন বলল, কাছে এসে দাঁড়াও। এখানে। সুমন নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। এত বৃষ্টিতে না এলে, আমি তো ভাবতাম, কী করে তুমি আসবে।

নীলা দেখল বৃষ্টি যা পড়ছে তা আর শাখাপ্রশাখার ওপর নয়, একেবারে সুমনের মাথার ওপর। সুমন ভিজে যাচ্ছে দেখে নীলা বলল, দূরে কেন, এখনো তোমার সঙ্কোচ কাটল না। আমি তো আর ফ্রক পরি না এখন।

অদিতি খাবার হাতে ঘরে ঢুকে প্রথমে অবাক হল দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে। পরে বুঝল সুমন কিছু ভাবছে। জানলার গরাদেতে একটা হাত

রেখে খুব উদাস তাকিয়ে বাইরেটায়। মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে বাহুর ওপর। ঝুঁকে, প্রায় হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদিতি ধাক্কা দিল না কি হাসল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে গলায় ডাকল, সুমন।

সুমন ঘুরে দাঁড়াল। বেশ খানিক অপ্রস্তুত হয়েছে এমনভাবে চোখ করে বলল, আরে রেডি? টেবিলের কোনায় ঠেক রেখে বসল। দে।

ভাল হয়ে চেয়ারে বোস। অদিতি প্লেটটা এগিয়ে হাতে দিল। কী ভাবছিলি?

আরে আরে দারুণ বানিয়েছিস। সুমন উচ্ছল হল। মুখের ভেতর বেশ খানিকটা চিড়ের হালুয়া পুরে দিয়ে বলল, ভাবছিলাম? একটু জল খেল। খেয়ে বলল, কবিগুরুর গানের ভাষায় 'পুরানো সেই দিনের কথা।'

ভাবো। বেশ আরাম করে ভাবো। তারপর চা-এর কাপটা সুমনের হাতে দিয়ে নিজের কাপটা নিল। নিয়ে বলল, নতুন দিনের কথা ভাববি কবে?

সে তো অহোরাত্র ভাবছি। পুরনো দিন মানেই তো স্মৃতি। সুমন প্লেট সরিয়ে রেখে চায়ের কাপ হাতে নিল। এক-একসময় স্মৃতি বড় সুখকর। ভাল লাগে ভাবতে।

বিকেল মরে গিয়ে সন্ধ্যা নামছিল। সুমন জিজ্ঞাসা করল, লালি ফেরেনি এখনো?

না বোধহয়। অদিতি ওর খালি কাপটা নিজের হাতে নিল। নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, ওহো,—

কি?

একেবারে বলতে ভুলে গেছি তোকে।

কি? সুমন যেন অবাক হল। কি কথা?

বাবার চিঠি এসেছে, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। তোকে বলতে একেবারে ভুলেই গেছি।

মানে জন্মদাতার? সুমন সিগারেট নিল হাতে। গ্রেট ফিলোসফার অব বেনারস কেমন আছেন?

ওসব কিছু লেখেননি।

তত্ত্ব কি দিয়েছেন দার্শনিক ব্যক্তিটি, প্রকৃতিকে জয় করেছেন?

ফাজিল।

তবে?

স্টার অব বেথেলহেমে ফুটবে!

সে আবার কি? ফুলটুল নাকি? সুমন জিজ্ঞাসা করল।

ফুল।

অদিতি বলল, যা না, না হয় দিনদুয়েক ঘুরেই আয় না।

সুমন জবাব দিল না।

অদিতি বলল, যাবি? দিনকয়েক না হয় ঘুরেই আয় না?

ভাড়া? সুমন সুঁচলো মুখ করে হাত পাতল।

হবে। অদিতি এবার বলল, অত সহজে পোষ মানলি যে?

না মেনে উপায় কি?

তার চেয়ে অন্য কারোকে যদি পোষ মানাতিস? অদিতি আঁচল দিয়ে এবার হাসির রেখা মুছল।

ওটা তুইও তো পারতিস? সুমনও রসিকতা করতে ছাড়ল না।

আমি মেয়ে, সাপুড়ে নই। তাছাড়া কে আমার পোষ মানল কি মানল না ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

ঘামালে পারতিস। সুমন বলল, তাহলে থাকত। উড়ে যেত না। সুমন এবার আক্রমণ করবার ভঙ্গিতে চেয়ারের ওপর পা তুলে বসল।

অদিতি রাগল না।

সুমন এবার অনেকখানি ঢিলেঢালা হয়ে বসে হাই তুলল। তুলে বলল, তেমন বাঁশি তোর হাতে নেই তাই বল। সাপুড়ের দোষ দিয়ে কী হবে?

তবুও কথা বলল না অদিতি।

ঢোড়া সাপই মজাতে পারলি না তার ওপর জাত সাপ?

অদিতি বলল, তুই বাহাদুর, তুই অনেক কিছুই পারিস। এতই যখন বুঝেছিস তখন দুধকলা খেতে যাস কেন?

সুমন বুঝল অদিতি কোনদিকে কথা বলতে চাইছে। বরং সুমন আরো জোরে হেসে উঠল। বলল, আমার বিষদাঁত ভেঙে গেছে। সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে ফেলেছে।

বেদে নয়, বল বেদেনী।

ওই হলো। সুমন বলল।

তা আমি জানি। অদিতি বলে, তোদের তো দীর্ঘদিনের আলাপ, তাহলে বাড়িতে আনিস না কেন?

পাগল!

কেন, এতে পাগলামির কী হলো? অদিতি অনুযোগ করল।

আমাদের হালচাল, আদবকায়দার সঙ্গে তো অভ্যস্ত নয়? দেখলে হয়ত ঘাবড়ে যাবে।

যাবে তো যাবে। আনিস। বলিস আমি বলেছি।

বামনদি ঢুকল। দিদিমণি, বাইরে কে ডাকছে দাদাবাবুকে। বামনদির সঙ্গে অদিতি চলে এল এ ঘরে।

দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলল সুমন। আরে তুই? প্রায় ভূত দেখার মত অবাক হল সুমন। দরজা বন্ধ করে সুমন বলল, আয় ওপরে আয়। পিছু পিছু ওপরে উঠল রুদ্র।

পাশের ঘরে এল অদিতি। বুঝল সুমন নিজের ঘরের টেবিল পাখা চালাল। আলো জ্বালল। কিন্তু কে তা বুঝল না অদিতি। এ ঘরে এসে দেখল লালি বালিশের ওপর বুক রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

পাশাপাশি দুখানা ঘর। মাঝ সিঁড়ির মুখে গ্যারাজের ওপর ঘরটা সুমনের এ বাড়ির ড্রইং রুম। গ্যারাজ ঘরে একটা ডাইংক্লিনিং। এই ঘর থেকে কয়েক সিঁড়ি উঠলে লম্বা বারান্দা। বারান্দাকে সামনে রেখে পরপর দুখানা ঘর। একখানা অদিতির। লালি আর অদিতি পাশাপাশি শোয় একটা খাটের ওপর। অপরটা ব্যবহার হয় লোকজন এলে। নইলে টুকিটাকি জিনিসপত্র আর ভাঁড়ারের সঙ্গে বামনদির দখলে। সুমনের ঘরখানা ছোট, নিচু। একখানা ছোট খাট কোনকালের। গোটা দুই চেয়ার, একটা টেবিল। মেঝে ভর্তি স্তূপীকৃত কাগজপত্তর বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে। একটা ছোট কাঠের সেলফ আছে, কিছু দেশী-বিদেশী লেখকের নামকরা বই, পরিচিত নামী লেখকের কিছু সই করা বই তাতে সাজানো। একটা আয়না তার পাশে পেরেকে ঝোলানো। আগে বাবা থাকতেন এ ঘরে, যখন এ বাড়িতে ছিলেন। তারপর পিসিমা। পিসিমা দেহ রেখেছেন গত চার বছর হয়ে গেল।

বেনারসেও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির প্রচ্ছন্ন কোনো গর্ব বাবার আজ বেঁচে নেই। কাশীবাসীর ইচ্ছায় যাঁরা জমিদারি করেছিলেন, সে দশ পুরুষ আগে। তাঁরা একে একে সকলে চলে গেলেন। শুধু অভিমানটুকু বাবা এখনো পুষে রেখেছেন। সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ করেন। এ ঘর থেকে ওঘর ঘুরে বেড়ান। দুর্গোৎসবের মুখরতা, দোলমঞ্চের শিহরণ অনুভব করেন আজ দোল পূর্ণিমায়, শরতের পেঁজা তুলো ছড়ানো আকাশে তাকালে।

আর তখনিই ছুটে যান ফুলেদের কাছে। বাবার এখনো এই বয়েসে তাই একটাই শখ। নানা দেশের, নানা জাতের ফুল, বাবার ফুল বাগানে। বাগান বলতে গঙ্গার দিকে মুখ করে পড়ে থাকা একখণ্ড পরিত্যক্ত জমি। বাবা তার ওপর ফুল ফোটান এখন। ওই নিয়েই

[এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়]



গৃহসজ্জায় রঙের সমাবেশ

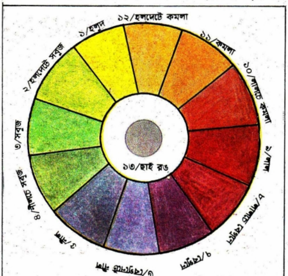
গৃহসজ্জার ব্যাপারে রঙের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, মানুষের মনের ওপর রঙের নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন রঙ মানুষের মনে আনে স্ফূর্তির জোয়ার। আবার, কোন কোন রঙ মানুষের মনের ওপর ফেলে নৈরাশ্যের কালো ছায়া। সুতরাং ঘরের রঙ নির্বাচনের সময়েও আমাদের রঙের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে ঘরের রঙ নির্বাচন করতে হবে।

মোটামুটিভাবে, পৃথিবীতে যতরকমের রঙ আছে সেই রঙগুলিকে দুভাগে ভাগ করতে পারা যায়। যেমনঃ চড়া রঙ ও হাল্কা রঙ বা ঠাণ্ডা রঙ। যে কোন রঙের সঙ্গে কালো রঙ মিশিয়ে গাঢ় রঙ তৈরি করা যায়। আবার যে কোন গাঢ় রঙের সঙ্গে সাদা রঙ মিশিয়ে তাকে হাল্কা রঙে পরিণত করতে পারা যায়। যেমনঃ লাল হচ্ছে গাঢ় রঙ; তার সঙ্গে সাদা রঙ পরিমাণমতো মেশাতে পারলে পাওয়া যাবে সুন্দর গোলাপী রঙ। এইভাবে গাঢ় নীল রঙের সঙ্গে সাদা রঙ মিশিয়ে পাওয়া যায় আকাশী রঙ। আবার লাল, নীল রঙ মিশিয়ে পাওয়া যায় বেগুনী রঙ ও হলুদ আর নীল রঙ মিশিয়ে পাওয়া যায় সবুজ রঙ। এইভাবে দু'রকমের রঙ মিশিয়ে যে নতুন রঙগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে বলা হয় 'মিশ্র রঙ'। এ বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, লাল, নীল, হলুদ – এই তিন ধরনের রঙকে কখনোই অন্য রঙ মিশিয়ে তৈরি করা যায় না।

রঙের চাকায় পরপর ঘড়ির সংখ্যার মতো করে সাজানো আছে খাঁটি ও মিশ্র রঙগুলি। এই রঙগুলিকেও পরস্পর মিশিয়ে আরো নানা ধরনের রঙ তৈরি করতে পারা যায়। রঙের চাকাটিকে নিচে দেখানো হল।

কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রঙ মেশালে কোন্ রঙ হতে পারে তা এই রঙের চাকা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই রঙের চাকা থেকে আবার পরস্পর বিপরীত রঙ সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারা যায়। যেমনঃ নীল রঙের ঠিক বিপরীত রঙ হচ্ছে কমলা। আবার, লাল রঙের ঠিক বিপরীত রঙ হচ্ছে সবুজ। অবশ্য মাঝামাঝি ভাগগুলি দিয়ে নানা ধরনের মিশ্র রঙ তৈরি করতে পারা যায়। সাদা, কালো ও ছাই রঙ মোটামুটিভাবে সবরকম রঙের সঙ্গেই চলে যায়, কারণ এগুলি হচ্ছে নিরপেক্ষ রঙ। তবে রঙের ব্যাপারে সবসময় একথাই মনে রাখতে হবে যে, চড়া রঙের আধিক্যে মানুষের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়। আবার, ঠাণ্ডা রঙের আধিক্য মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কাজেই সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই দু'প্রকার রঙের ব্যবহারই বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, অযথা মানসিক শান্তি বা প্রফুল্লতার ব্যাঘাত না ঘটায়।

এছাড়াও দেখা যায় যে, বিভিন্ন ঘরের কাজের উপযোগী বিভিন্ন রঙের ব্যবহারের দিক ছাড়াও আরেকটি দিক আছে। সেটি হল মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক। এই কারণেই খাবার ঘর, পড়ার ঘর, শোবার ঘরের রঙ আলাদা হয় এবং এর পিছনেও কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা পরে করা যাবে।



এ তো গেল রঙের বিষয়ে একেবারে গোড়ার কথা। এবার দেখা যাক, দেয়ালে কতরকম রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের দেয়ালে সাধারণত চাররকম রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমনঃ চুন রঙ। এই রঙে সবচেয়ে কম খরচ পড়ে। দ্বিতীয়ত, ডিসটেম্পার – যা জলে গোলাও হতে পারে, আবার তেলে গোলাও হতে পারে। তেলে গোলা রঙ জলে গোলা রঙের তুলনায় ব্যয়সাপেক্ষ। সিমেন্ট পেন্ট – এটিও জলে গোলা রঙ যা সাধারণত বাড়ির বাইরের দিকের দেয়ালে ব্যবহৃত হয়। তবে ঘরের ভেতরের দিকের যদি কোনো দেয়ালে ড্যাম্প লাগে, সেই দেয়ালেও এই ধরনের রঙ ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যেতে পারে। আবার এগুলির মধ্যে সবচেয়ে দামী রঙ হচ্ছে প্লাস্টিক ইমালশন পেইন্ট। বাড়ির বাইরের দেয়ালের জন্য প্লাস্টিক অ্যাক্রালিক পেইন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তা সাধারণের ক্ষমতার বাইরে।

যাই হোক, রঙ করার সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যত দামী রঙই হোক না কেন, তার অপব্যবহারের দোষে যেমন ঘরটি বা বাড়িটি সৌন্দর্যহীন বা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে, তেমনি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে অতি সস্তায় চুন রঙ দিয়েও গৃহটিকে আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তোলা যেতে পারে।

শর্মিলা ঘোষ

গ্রামের মেয়েদের জীবন ও জীবিকা

স্বর্ণলতা মিত্র (ঘোষ)

গ্রামপ্রধান ভারতের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। বিংশ শতাব্দীতে নারীসমাজের পরিবর্তন এসেছে ঠিকই। কিন্তু গ্রামবাংলার নিম্ন পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার মান নিচুই রয়ে গেছে। এরা বেশির ভাগ বাগদী, দুলে, হাড়ি, ডোম, মুচি ইত্যাদি পরিবারের মেয়ে। এরা বিদ্যালয়ের ধারেকাছে আসে না। এ সব পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে জিনস্ বেলবটম্ পরে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে এ যেমন আমরা কোনদিন আশা করতে পারি না, তেমনি এই সর্বনিম্ন পরিবারের মেয়েরা খেতে না পেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াবে এ কথা ভাবতেও আমাদের কষ্ট হবে। কিন্তু না, সমাজবদলের সঙ্গে সঙ্গে গাঁ-ঘরের মেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। লেখাপড়া না শিখলেও এরা নিজেদের সম্বন্ধে আজ খুবই সচেতন। এরা আর পড়ে মার খেতে চায় না, গাঁ-ঘরের এ সব মেয়েরা আজ অনেকেই স্বনির্ভর। বুদ্ধিমতীও বটে। এদের কাছে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, শেখার আছে।

হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম বাঘাটী, গোপালপুর, জিয়াড়া, আঁইয়া, অনন্তরামপুর, লক্ষণপুর, ইছাপসর, সোনামাগুরী, কসপোঁতা; হাওড়া জেলার রাজাপুর, সন্তোষপুর, কমলাপুর এই সব গ্রামের বাগদী, দুলে, মুচি, জেলে, ডোম পাড়ার মেয়েদের জীবনের মান কিন্তু আগের তুলনায় এখন আর তেমন নিচু নয়। প্রত্যেকেই আজ দু পয়সা রোজগারের ধান্দায় ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। এদের জীবনের লক্ষ্য শুধু খেয়ে পরে বাঁচা নয়, — সংসার বাঁচানোও। এরা ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের মত বিলাসিতা করে অর্থ অপব্যয় করে না। এরা স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করে, ঘরসংসার সামলে রোজগারের জন্যে এদেরও বাইরে যেতে হয়। পদ্মা, সাবি, শঙ্করী, সুমিত্রা, লক্ষ্মী, পাঁচী মনসা, আহ্লাদী, রূপা এরা সবাই গাঁঘরের মেয়ে বউ। অনন্তরামপুর, ইছাপসর থেকেই প্রায় ষোল জন মেয়ে সবজি ব্যবসা করে। সবজির পশরা নিয়ে ভোর থাকতে এরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। এদের লরী ঠিক করা থাকে। বড়গাছিয়া থেকে এরা লরীতে ওঠে। হাওড়া, কদমতলাবাজার, কালীবাবুর বাজার, সন্ধেবাজার, শিবপুর বাজার, এই সব শহরের বাজার এদের বিক্রয় কেন্দ্র। এদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে এরা সবাই হাওড়া, হুগলী বা অন্যান্য জেলার গ্রাম থেকে আসে। সবজি বিক্রি হয়ে গেলে দুপুরের বাসে এরা বাড়ি ফেরে। নিত্যবাসযাত্রীদের মত এদেরও অনেক ধকল সহ্য করতে হয়। এ দৃশ্য অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। ব্যবসায়ী মেয়েরা সবজির খালি ঝোড়া বা পশরা নিয়ে বাসে উঠতে গেলে অনেকেই মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, যাও যাও এ সব বোঁচকা নিয়ে নেমে যাও। কিন্তু ওদের না গিয়ে উপায় নেই এ কথা কেউ বোঝে না। কোন রকমে লরীতে কিংবা যাত্রীভর্তি বাসের পেটে ঠেলে ওঠে। বাস স্টান্ডে নেমে দু'চার আনার মুড়ি-তেলেভাজা খেয়ে দুপুরের রোদ কমলে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে কোন রকমে দুটি ভাত খেয়ে সন্ধের আগে মাঠে যায়। মাঠে চাষীদের কাছ থেকে পাইকারি দরে সবজি কিনে আনে। রাত্রিবেলায় এই সব সবজি জল দিয়ে ডালায় সাজিয়ে রাখে। শাক হলে





আঁটি বেঁধে রাখে। সেদিন গাঁয়ের চাষী নিমাই পোড়েলকে প্রশ্ন করি, গাঁয়ের ব্যবসায়ী মেয়েরা সবজি ক্ষেতে এসে সবজি কিনে নিয়ে যায়, আপনাদের লোকসান হয় না? নিমাই পোড়েল বলে, না, আমাদের লোকসান হয় না। গাঁয়ের মেয়েরা ব্যবসায় নেমে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে বাজারে বিক্রি করতাম। এখন ওরা ক্ষেত থেকে নিজেরা এসে কিনে নিয়ে যাওয়ায় আমাদের রোজ নষ্ট হয় না। বিকেলের দিকে ক্ষেতেই সবজি বিক্রি করায় সকালের দিকে আমরা মাঠে খাটতে পারি। এখন জনমজুরী অনেক বেড়ে গেছে। গাঁ-ঘরের অনেক মেয়ে আবার ডিম ব্যবসা করে। যারা ডিমের ব্যবসা করে তারা প্রতিদিন হাটেবাজারে যেতে পারে না। এরা একদিন ছাড়া বাজারে যায়। এই সব মেয়েরা একদিন আগে পাড়া ঘুরে পাইকারি দামে ডিম কিনে শহরের বাজারে বিক্রি করে। এরা পাইকারি দামে ডিম কেনে ৫০-৫৫ পয়সা। সে ডিম শহরে ৯০ পয়সা দরে বিক্রি করে। বাঘাটীর সরসী বাগ ঘুঁটের ব্যবসা করে। নিজে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়। আবার গ্রাম থেকে পাইকারি দামে বস্তা বোঝাই করে ঘুঁটে কেনে। ঘুঁটের বস্তা মাথায় করে এনে স্টেশনে চেনা কোন দোকানে রেখে যায়। ভোরের দিকে খালি লরী পেলে বস্তা লরীতে তুলে দেয়। খালি লরীতে সামান্য ভাড়া দিয়ে শহরে পৌঁছায়। শহরে গিয়ে চড়া দামে ঘুঁটে বিক্রি করা যায়। সরসী বলে, কন্টেছিল্টে একবার ঘুঁটে বয়ে নে যেতে পারলে দশ টাকায় দশ টাকাই লাভ হয়।

সৌদামিনী সাধুখাঁর মত অনেক মেয়েই ঠোঙার ব্যবসা করে। বড়বাজারের কাগজপট্টি থেকে সস্তা দামে কাগজ কিনে এনে বাড়িতে মেয়েদের নিয়ে ঠোঙা তৈরি করে। সেই ঠোঙা দোকানে দোকানে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করে। কেউবা শহরের বাজার থেকে বরফ দেওয়া মাছ এনে গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করে বিক্রি করে। শহরে সকলকেই মুড়ি কিনে খেতে হয়। কিন্তু সেই মুড়ি যোগান দেয় গাঁয়ের অধিকাংশ মেয়েরা। গাঁয়ের যে সব মেয়েরা মুড়ি ব্যবসা করে তারা পাইকারি দামে মুড়ির চাল কিনে বাড়িতে মুড়ি ভেজে বস্তা করে দোকানে দেয়। কেউবা নিয়মিত খদ্দের ঠিক করে রাখে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুড়ি দিয়ে আসে। মুড়ি ব্যবসা যারা করে তাদের দৈনিক ২০-২২ টাকা লাভ হয়।

গাঁয়ের মাঠেঘাটে অনেক মেয়েকেই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তারা কেউবা শুজনি, কলমি নটে, হিংচে তোলে, কেউ শামুক গেঁড়ি তোলে। মাছ ধরেও হাটেবাজারে বিক্রি করে দু'চার পয়সা রোজগার করে।

এই সব নিম্ন পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে বিশেষ পণ দিতে হয় না। যা দিতে হয় তা খুবই সামান্য। তার জন্য পাত্রপক্ষ পীড়ন করে না। একটা থালা, একটা বাটি, একটা গ্লাস বা ঘটি। মেয়েকে কানের দুল দু'চার পয়সা সোনার। ছেলেকে দু'চার পয়সা সোনার একটা আংটি। অবস্থা অনুযায়ী দু-একশো টাকা নগদ চায়। এই সব নিম্ন-পরিবারের মেয়েরা কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে কোন কারণে নির্যাতন করলে তা মুখ বুজে সহ্য করে না। শ্বশুরবাড়িতে তেমন কিছু বাড়াবাড়ি করলে সোজা পোঁটলাপুঁটলি বগলে করে মায়ের ঘরে চলে আসে। শ্বশুর বাড়ি থেকে নিতে এলেও যেতে চায় না। এই সব মেয়েরাও সামান্য পুঁজি যোগাড় করে ব্যবসায় নেমে পড়ে।

এমনি দুজন মেয়ের কথা বলছি শ্যামলী বাগ, পুষ্প পাত্র। শ্যামলীর বাপের বাড়ি বাঘাটী গ্রামে। বিয়ে হয়েছিল কেষ্টরাম-পুরে। স্বামী নেশাখোর। নেশা করে মারধোর করত বলে একদিন রাগ করে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ব্যবসা শুরু করে। শ্যামলী মশাট, জাঙ্গীপাড়ার হাট থেকে সবজি এনে কদমতলায় বিক্রি করে। অনেকদিন পরে জগৎবল্লভপুরে বাস স্ট্যান্ডে শ্যামলীকে দেখে চিনতে পারিনি। শ্যামলীর সিঁথিতে সিঁদুর গলায় রুপোর হার। হাতে সোনার চুড়ি। শ্যামলী পরিচয় দেয়। চিনতে পারি। জিজ্ঞেস করি, তুমি এখন কোথায় থাকো? বলে, বাপের ঘরে আর থাকিনি। বলি, তবে কোথায় থাকো? বলে, আবার বে করেছি। বলি, তোমার স্বামী কি করে? বলে, আমরা দোজনাই আনাজ ব্যবসা করি। হাবড়া থেকে বরফের মাছ এনে হেতাকার বাজারে বেচি।



শ্যামলীকে দেখে মনে হলো সে এখন সুখী। পুষ্প শ্বশুরবাড়ির অশান্তি সহ্য করতে না পেরে মায়ের কাছে চলে এসেছে। পুষ্প এখন ধান চালের কারবার করে। গ্রামের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে লোন পেয়েছে। সেই টাকা দিয়ে ধান কিনে চাল তৈরি করে বিক্রি করে। এই সব গাঁ-ঘরের মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবেশির সহযোগিতায় বা আত্মীয়দের সহযোগিতায় শহরে লোকের বাড়ি কাজ করতে যায়। শহরে যে সব মেয়েরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে চাকরি করে তাদের রাতদিনের লোকের সমস্যা কিছুটা সমাধান করে এই সব গাঁ-ঘরের মেয়েরা শহরে এসেই। এদের রোজগার কম নয়। খেয়ে পড়ে মাসে ৫০-৬০ টাকার ওপর। গাঁ-ঘরের দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা যদি নিজের উপর বিশ্বাস রেখে স্বনির্ভর হবার জন্যে ব্যবসাকেই বেছে নেয় তবে দারিদ্র্য এদের কাছে কোনদিন ঘেঁষতে পারবে না। পরিশ্রমীর দুয়ারে লক্ষ্মী অবশ্যই বিরাজ করবেন।

ফটো : অভিজিতা রায়



সপন ঘি আপনাকে নিয়ে যাবে অতীতের সেই দিনগুলিতে যখন পরিবারের কারও বিয়ের অনুষ্ঠানে বন্ধু বান্ধব আর আত্মীয় পরিজনের আনাগোনায় পুরো পরিবেশটাই হয়ে উঠতো আনন্দমুখর।

তাদের হাসির কলরোল, সানাইএর মধুর স্বর আর খাঁটি দেশী ঘি-এ বানানো রকমারি মিষ্টির লোভনীয় সুগন্ধ,—সব মিলিয়ে সারা বিয়ে বাড়ীটাই কেমন যেন স্বপ্নময় মনে হতো।

বাড়ীতেই ভিয়েন বসানো হতো। হালুইকরের দল, খাঁটি, তাজা জিনিসগুলি ঠিক ঠিক মতন দিচ্ছে কিনা, তার দেখা শোনায় ব্যস্ত থাকতেন বাড়ীর বয়স্করা সবাই।

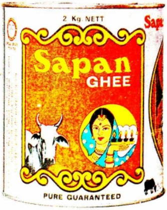
এর জন্য অবশ্যই খাঁটি ঘি অপরিহার্য ছিল। কারণ এই বিশেষ দিনটিতে সব কিছুই হওয়া চাই একেবারে নিখুঁত।



আমরা সবসময় **বৃজভূমির** সবুজ চারণ ক্ষেত্রের টাটকা গরুর দুধ দিয়ে বানাই এই সুগন্ধি, দানাদার ঘি।

আজও পযন্ত আমরা পরম্পরাগত উপায়েই এই ঘি তৈরী করে আসছি। ঠিক যেভাবে বানানো হতো **ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র বৃজভূমিতে**। আর সেই জন্যই সপনের চেয়ে ভাল ঘি আপনি কোথাও কিনতে পাবেন না। একেবারে খাঁটি, টাটকা আর স্বাস্থ্যকর।





সপন

বৃজভূমি থেকে আসল দানাদার ঘি

CLARION 223

চাকুরে মেয়েদের মা হওয়ার সমস্যা

মিলনরানী বিশ্বাস

পার্ল এস বাকের বিখ্যাত উপন্যাস 'দি গুড আর্থ'-এ চৈনিক রমণী ওল্যানের কথা পড়েছিলাম। তিনি মাঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়। ওল্যান ঘরে ফিরে যান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। দু'ঘন্টার পর তাঁকে আবার জমি চাষ করতে দেখা যায়।

গল্পটাতে হয়ত বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, তাহলে কী যেসব মেয়ে কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁদের সুপ্রসব হয়? আর যাঁরা কায়িক পরিশ্রম করেন না তাঁদের কী প্রসবের কষ্ট বেশি? ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মত।

আমাদের দেশের মেয়েরা আজ অফিসে-অফিসে, কলে-কারখানায় কাজ করছেন। অর্থনৈতিক কারণেই হোক আর নিজের নিরাপত্তার জন্যই হোক সে কথা আলাদা। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছেন চাকুরে মেয়েদের সমস্যা কত? সমস্যা অনেক। সে সমস্যা ঘরে, বাইরে, মনে সর্বত্রই।

চাকুরে মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রম কম। মানসিক পরিশ্রমই বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস সোয়া দশটা থেকে সোয়া পাঁচটা। রাজ্য সরকারের হলে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা। বেসরকারী অফিসের নিয়মকানুন অবশ্য আলাদা। মোটকথা অফিস মানেই গতানুগতিক ছকেবাঁধা জীবন। কোনরকমে অফিসে ঢুকলে কাজটা মূলত চেয়ার-কেন্দ্রিক। নড়ন-চড়ন কম।

কিন্তু অফিসে আসাটা কি অতই সহজ? মোটেই তা নয়। তার পেছনে একটা লড়কে-লেঙ্গের কাহিনীও থাকে। *সে কথা তো সকলেরই জানা।*

তাই বলে সংসারে যেসব মেয়ে কাজ করেন তাঁদের কী কোনো সমস্যা নেই? আছে। তবে ধরনটা একটু আলাদা। সারাদিনই একাজ-ওকাজে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। ফলে, কায়িক পরিশ্রম তাঁদের বেশি। শরীর সুগঠিত রাখতে এসব মেয়েদের পৃথকভাবে ব্যায়াম করবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

আগেই বলেছি, চাকুরে মেয়েদের কাজ মূলত চেয়ার-কেন্দ্রিক। প্রতিদিন সাত ঘন্টা বসে-বসে কাজ করলে বছরে কত ঘন্টা হয় একবার ভেবে দেখেছেন কী?

তাই বলে সব চাকুরে মেয়েদের কাজই কী চেয়ার-কেন্দ্রিক? না, তাও নয়। যেসব মেয়েরা ইটখোলায়, চা-বাগানে আর রাস্তায় কাজ করে তারা চেয়ার পাবে কোথায়? চেয়ার না পেলেও তারা কিন্তু একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। সেটা আজকের প্রসঙ্গ নয়। প্রসঙ্গ চেয়ার-কেন্দ্রিক চাকুরে মেয়েরা।

শিক্ষিকা, নার্স, কেরানি, টেলিফোন-অপারেটর, রিসেপশনিস্ট ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের কায়িক পরিশ্রম কম। প্রায় মেয়েই মুটিয়ে যায়। ওজন বাড়ে। এমনিতেই লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পেতে মেঘে-মেঘে অনেক বেলা বেড়ে যায়। চাকুরে মেয়েদের আবার বেশি বয়সে বিয়ে করার দিকেও একটু ঝোঁক আছে। এর পরিণতিও শুভ নয়। তারপর বেশি বয়স, চেয়ার-কেন্দ্রিক চাকরি ও স্থূলতা-এ তিনটে উপসর্গ এক সঙ্গে দেখা দিলে সমস্যা আবার মারাত্মক আকার ধারণ করে। কী ভাবে?

যেসব মেয়েরা কায়িক পরিশ্রম ঠিকমতো করেন না, তাঁদের গর্ভে বাচ্চারাও প্রায়ই ঠিক অবস্থায় থাকে না।

কারণ, গর্ভসঞ্চারের পর পাঁচ মাস পর্যন্ত গর্ভে বাচ্চার চেয়ে জলের পরিমাণই থাকে বেশি। বাচ্চা থাকে ঠিক তার মাঝে ভাসমান অবস্থায়। মানুষের মাথা সবসময়ই ভারী। ফলে গর্ভাশয়ে থাকাকালীন সময়েও বাচ্চার মাথাটা ভারীই থাকে। এ সময় বাচ্চা গর্ভাশয়ে নড়াচড়া করে। কখনো কখনো ধীর মন্থরগতিতে ঘোরেও। কায়িক পরিশ্রম করলে স্বভাবতই পেটেও তার দোলা লাগে। গর্ভাশয়ও মৃদু আন্দোলিত হয়। ফলে বাচ্চার মাথাটা ঘুরে গিয়ে অন্য অবস্থায় থাকলেও পুনরায় নিম্নমুখী হয়। ৮/৯ মাস হয়ে গেলেও গর্ভবতী মেয়েরা বাচ্চার নড়াচড়া বুঝতে পারেন। এ সময় গর্ভাশয়ে জলের চেয়ে বাচ্চার ওজন ও আয়তন বাড়ে। ফলে বাচ্চা নড়াচড়া করলেও মাথাটা স্থানচ্যুত হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এই 'হেড প্রেজেনটেশান' (head presentation) থাকলে অর্থাৎ বাচ্চার মাথাটা নিচের দিকে থাকলে স্বাভাবিক প্রসব হয়। কায়িক পরিশ্রম ঠিকমতো না করলে বাচ্চা অনেক সময় 'ব্রিচ প্রেজেন্টেশান' (Breech presentation)-এ থাকে। অর্থাৎ বাচ্চার কোমরটা থাকে নিচের দিকে। আবার কোনো বাচ্চা থাকে 'শোলডার প্রেজেনটেশান' (Shoulder presentation) অবস্থায়। অর্থাৎ বাচ্চার কাঁধটা থাকে নিচের দিকে। এ অবস্থায় থাকলে প্রসবের সময় যে-কোনো একটা হাত বেরিয়ে আসতে পারে। আবার কখনো বাচ্চা গর্ভাশয়ের থাকে একদম আড়াআড়ি অবস্থায় (Transverse position).

আবার কায়িক পরিশ্রম ঠিকমত করলেও কিন্তু বেশি বয়সের মহিলাদের গর্ভে বাচ্চা অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে। কারণ বেশি বয়সের মহিলাদের ইউটেরাস-এ (uterus) টিউমার থাকবার সম্ভাবনা বেশি। আর টিউমার বড় হলে গর্ভাশয়ের জায়গা অনেকটা কমে যায়। এর ফলে বাচ্চা গর্ভাশয়ে ঠিকমত থাকতে পারে না। তাছাড়া মেয়েদের বয়স ত্রিশের বেশি হলে তাঁদের অভোলেশান (Ovolation) কমে যায়। ফলে গর্ভধারণের (Pregnancy) সম্ভাবনাও কমে যায়।

কৃত্রিম উপায়ে অবশ্য ওভাম (Ovum) তৈরি করানো যায়। আর কৃত্রিম ওভাম (Ovum) দিয়ে গর্ভসঞ্চার করানো হলে, তার ফলে যদি যমজ (Twin) সন্তানের সূচনা হয় তবে তার ফলও শুভ নয়। এর ফলে প্রসূতির পা ফোলে, রক্তচাপ বাড়ে ও প্রস্রাবের (Urine) সঙ্গে প্রোটিনও বেরিয়ে যায়। মোটকথা, সেসব ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। প্রসূতির দুর্ভোগের সম্ভাবনা বাড়ে।

চাকুরে মেয়েদের মা হওয়ার কষ্ট *আরেকটা কারণেও বেশি। সেটা হচ্ছে মানসিক উদ্বেগ।* মানসিক চিন্তাভাবনার *কুফল সম্পর্কে সকলেই সচেতন বলে মনে* করি। তবুও বলে রাখা ভাল, সে দুশ্চিন্তা সরাসরি মস্তিষ্কে (Brain) পৌঁছে যায়। এর ফলে ভাল ঘুম হয় না। খাওয়ার ইচ্ছা কমে যায়। আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। গর্ভাবস্থায় খুব বড়রকমের মানসিক আঘাত পেলে সন্তান বোবাও হতে পারে।

সাধারণত প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই প্রসব হওয়া উচিত। কিন্তু মানসিক উদ্বেগ ও গর্ভে অস্বাভাবিক বাচ্চা থাকলে প্রসব বেদনাও ঠিকমতো ওঠে না। একটু ব্যথা হয়, আবার থেমে যায়। অনেক সময় শুধু কোমরেই ব্যথা হয়

(Back pain)। সে ব্যথা পূর্ণতা পায় না, অর্থাৎ সামনের দিকে সে ব্যথা আসে না। ফলে প্রসূতি কষ্ট পায়। মানসিক উদ্বেগ (Mental-tention) বাড়ে।

'আর ব্যথা সহ্য করতে পারছি না, কেটে বের করে দিন।' একটু ব্যথা শুরু হলেই অনেক প্রসূতি এ-কথা বলেন। প্রসূতির আত্মীয় স্বজনও একই অনুরোধ করেন। একটু দেরি করলে স্বাভাবিক প্রসবও হতে পারত। না হয় ফরসেপস্ (Forceps) ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সে কথা তাঁরা শোনেন না। ফলে অনেকসময় চাপে পড়েও অপারেশন করতে হয়। মূলত চাকুরে মেয়েদের মানসিকতা একটু ভিন্ন মেজাজের। প্রসব কি করে হয় সে-সম্পর্কে তাঁদের মোটামুটি একটা পূর্বারোপিত ধারণাও থাকে। এ মানসিকতাও সবসময় মঙ্গলজনক নয়।

বর্তমানে হাসপাতালগুলিতে শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ প্রসূতিকে অপারেশন করার দরকার হয়। শতকরা ৪০ জনের ফরসেপস (Forceps) ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিক প্রসব শতকরা ২০ জনের। আর নার্সিং হোমের শতকরা ৬০ জন প্রসূতিকে অপারেশন করার দরকার হয়। শতকরা ৩০ জনের ফরসেপস ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিক প্রসব হয় মাত্র শতকরা ১০ জনের।

এঁরা সবাই হয় চাকুরে মেয়ে, না-হয় বয়স এঁদের বেশি। অনেক প্রসূতিকে ক্ল্যাসিক্যাল অপারেশন করতে হয়। অর্থাৎ পুরো আপার ইউটেরিন সেগমেন্ট (Uper uterin segment) কাটতে হয়। বাচ্চার অস্বাভাবিকতা কম হলে লোয়ার ইউটেরিন সেগমেন্ট (Lower uterin segment) কাটলেই চলে।

চাকুরে প্রসূতিদের সমস্যা আরো আছে। যেমন – গর্ভাবস্থায়ও তাঁদের অফিসে যেতে হয়। এ সময় পেটে বেসামাল ধাক্কা লাগলে বাচ্চা গর্ভেই মারা যেতে পারে।

তবে আশার কথা এই যে, আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। সময়মত অভিজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে প্রসূতির জীবনহানির কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

আর এ-কথা তো সবরাই জানা যে, গর্ভাবস্থায় হালকা কাজ নিয়মিত করা দরকার। যাঁরা তা না করেন তাঁদেরও স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা থাকে না। চাকুরে মেয়েদের সকালের দিকেই অফিসের পথে নামতে হয়। বাড়ি দূরে হলে ফিরতে নির্ঘাত রাত হয়। তাঁদের ঘরোয়া কাজ করবার সময়ই বা কই? কিন্তু যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? বাঁধতে হয়। এটাই স্বাভাবিক। চাকরি করলেও 'মা'-ডাক শুনতে কার না ইচ্ছে করে?

গ্রামের মেয়েদের তো কম বয়সেই বিয়ে হয়। তাঁরা কায়িক পরিশ্রমও করেন। ফলে তাঁদের গর্ভের বাচ্চার অবস্থানও ঠিক থাকে। অর্থাৎ মাথাটা গর্ভে নিচের দিকেই থাকে। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের প্রসব বেদনা শুরু হয়। আর সে-ব্যথা সহ্য করবার মতো মানসিক প্রস্তুতিও তাঁদের থাকে। কারণ তাঁরা শৈশব থেকেই দেখে এসেছেন, গ্রামের মেয়েদের প্রসব ওভাবেই হয়।

প্রসবের সময় এ সমস্ত অসুবিধা হয় বলে কি চাকরি ছেড়ে দেবেন? না, সে কথা বলছি না। তবুও টিফিনের সময়টাতে চুপচাপ বসে না থেকে হাঁটা-চলা করুন, তাতে আপনার উপকারই হবে।

হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আপনি কি টেলিফোন অপারেটর? তা হলে মাঝে মাঝে ১০ মিনিট করে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কাজ করতে পারেন। এটা আপনারই ভালোর জন্যে। বাড়িতে অন্য কাজ করবার সময় না পেলেও শুধু ঘরটাও তো মুছতে পারেন। গর্ভাবস্থায় ঘর মোছাটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই উপকারী।

লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পেতে একটু বেশি বয়স হয়েছে? হোক না, তাতে ক্ষতি কি? আর দেরি না করে এবার কিন্তু আপনার বিয়েটা করা দরকার। বিয়ের পর অযথা সময় নষ্ট করবেন কেন? ৩০ বছরে মাঝেই সন্তান যা হবার হয়ে যাক। তা না হলে প্রসবের কষ্টই শুধু বাড়বে।

বাড়িতে বা বাসায় একটু কাজ করলে ক্ষতি কি? সাময়িক কষ্ট হবে? তা হোক। এতে যে আপনারই মঙ্গল। অযথা চিন্তা-ভাবনা একেবারেই করবেন না। জীবনে দুঃখ-কষ্ট তো থাকবেই। তাকে কি হাসিমুখে বরণ করা যায় না? গর্ভাবস্থায় পথ চলবেন খুব সাবধানে, ভিড় এড়িয়ে। তা না হলে আপনার গর্ভস্থ সন্তান বিপদাপন্ন হতে পারে। চাকরি করে টাকা যখন আয় করছেনই, তখন গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য খেতে ভুলবেন না কিন্তু। আমাকে প্রসবের সময় সিজারিয়ান অপারেশান করাতেই হবে – এ জাতীয় চিন্তা একেবারেই করবেন না। আমার কথা কটি মেনে চলুন, চাকরি করলেও আপনার স্বাভাবিক প্রসব হবে।



ঘি ভাত



চাইনীজ ফ্রায়েড রাইস – 'তাইওয়া'-র সৌজন্যে



সাউথ ইন্ডিয়ান ফ্রায়েড রাইস – 'আনন্দ'-এর সৌজন্যে

রান্না
ফ্রায়েড রাইস

'ফ্রায়েড রাইস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হবে 'ভাজা ভাত'। দেখা যাক, ভাত কিভাবে ভাজা যায়!

ফ্রায়েড রাইস তৈরির প্রথম এবং প্রধান উপাদান হল 'রাইস' বা চাল। চাল যত সুগন্ধী এবং মিহি হবে, ফ্রায়েড রাইস তত সুস্বাদু হবে। আতপ এবং সিদ্ধ দু'রকম চালেই 'ফ্রায়েড রাইস' করা যায়। আতপ চাল একটু নাড়াচাড়া করলেই ভাত দলা পাকিয়ে যায়; ঝরঝরে ভাত হয় না। তবে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করলে নাড়াচাড়ার দরকার হয় না। ঝরঝরে ভাত তৈরি করা যায়।

আমাদের ঠাকুমা-দিদিমার আমলে 'ফ্রায়েড রাইস' নামটা অজানা ছিল। তাঁরা রান্না করতেন সুগন্ধী ও সুস্বাদু 'পোলাও'। পোলাও আমিষ ও নিরামিষ দুই-ই হয়।

'পোলাও' রান্না করতে উপকরণ এবং সময় দুই খুব বেশি দরকার। এখন মেয়েদের রান্নাঘরে বেশিক্ষণ থাকবার মত সময় হাতে নেই। তবু তার মধ্যে যতটুকু উপাদেয় রান্না করা যায়! সাধারণত, ভারতীয় মেয়েরা যে 'ঘি-ভাত' রান্না করেন, তাকেই অন্যান্য দেশে 'ফ্রায়েড রাইস' বলে। চাইনীজ ফ্রায়েড রাইস অবশ্য একটু অন্য ধরনের। যাই হোক, প্রথমে আমাদের সাবেকী রান্না 'ঘি-ভাত' নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ঘি-ভাত

উপকরণ ঃ 'বাসমতী' কিংবা 'কামিনী' কিংবা 'গোপালভোগ' বা যে কোনো সুগন্ধী মিহি চাল, বিশুদ্ধ ঘি, চিনি, কিসমিস, কাজু বাদাম, তেজপাতা, গরম মশলা ও নুন।

প্রণালী ঃ আধসিদ্ধ ভাত নামিয়ে ঝুড়িতে রেখে জল ঝরিয়ে নিন। ডেকচিতে ঘি দেবেন একটু বেশি পরিমাণে যাতে আধসিদ্ধ ভাত বেশ ভালোভাবে ভাজা যায়। তেজপাতা, গরম মশলা, ভিজানো কিসমিস, কাজু বাদাম ও অল্প নুন ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। ওপর-নিচ নাড়াচাড়া করে ভাজতে থাকুন। চিনির পরিমাণ একটু

বেশি হবে। ঘি-ভাত মিষ্টি স্বাদের হয়। অবশ্য রুচিমাফিক হওয়া ভালো। চিনি মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। ভাত বেশ নরম হয়ে এলে নামিয়ে ডেকচিটা ঝাঁকানি দিয়ে ভাতগুলো ওপর-নিচ করে নিন।

আরও সহজে ঘি-ভাত করা যায়। চাল ধুয়ে ঘিয়ে ভেজে নিন। অল্প নুন, তেজপাতা, গরম মশলা, কিসমিস, বাদাম, চিনি মিশিয়ে বেশ করে নাড়াচাড়া করে পরিমাণমত জল দিয়ে প্রেসার কুকারে চাপিয়ে দিন।

জলের পরিমাণ হবে – এক কাপ চালঃ চার কাপ জল। দুবার হুইসিল দিলেই জানবেন, ভাত তৈরি হয়েছে। আরও সুস্বাদু করতে হলে এক রতি জাফরান এক কাপ দুধে গুলে চালের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন এবং জলের পরিমাণ এক কাপ কমিয়ে দেবেন।

চাইনীজ ফ্রায়েড রাইস

উপকরণ ঃ সুগন্ধী ও মিহি চাল, বাদাম তেল, নুন, সবজি (গাজর, বীন, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, পেঁয়াজ, আদা, কাঁচালঙ্কা), চিংড়ি মাছ, মুরগীর মাংস, সোয়া সস, আজিনামোটো।

প্রণালী ঃ আধসিদ্ধ ভাত দু'ভাগ করে দুটো থালায় ছড়িয়ে শুকিয়ে নিন।

ডেকচিতে বাদাম তেল গরম করে একটা থালার ভাত ভাজুন। ভাজবার সময় অল্প নুন মিশিয়ে দিন। এবার অন্য থালার ভাত ভেজে নিন।

ভাজা হয়ে গেলে একটা বড় পাত্রে সব ভাত ঢেলে রাখুন। সবজিগুলো কেটে ধুয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ করবার সময় অল্প নুন দেবেন। পেঁয়াজ সিদ্ধ না করে ভেজে নিলে ভালো লাগবে। আদা, কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে রাখুন। মাছ ও মাংস সিদ্ধ করে রাখুন। এবার সব সবজি, মাছ ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। মাংসের হাড় বেছে ভাতের সঙ্গে মেশান।

পরিবেশনের সময় অল্প সোয়া সস ও আজিনামোটো মিশিয়ে দেবেন। এগুলি স্টেশনারি দোকানে পাবেন।

দক্ষিণ ভারতীয় ফ্রায়েড রাইস

দক্ষিণ ভারতীয়রা একরকম ফ্রায়েড রাইস রান্না করেন যাতে মিষ্টি একেবারে নেই। বেশ লেবু লেবু গন্ধ লাগে, সঙ্গে টকের স্বাদও।

উপকরণ ঃ চাল, ঘি, নুন, আদা, পেঁয়াজ, তেজপাতা, সরষে, কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবু।

প্রণালী ঃ বেশ ঝরঝরে ভাত রান্না করে নিন। ডেকচিতে ঘি গরম করে আদা, পেঁয়াজ, লঙ্কা কুচো, তেজপাতা, সরষে ফোড়ন দিয়ে ভাত ঢেলে দিন। অল্প নুন মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে ঝরঝরে করে নিন। নামিয়ে রেখে কয়েকটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে মিনিট পনের চাপা দিয়ে রাখুন।

পরিবেশনের সময়ে ঢাকা খুললে লেবুর গন্ধ খুব ভালো লাগে।

রাধা মিত্র

ফটো ঃ সৌগত রায় বর্মন

কিছুই যায় না ফেলা

আমাদের সাংসারিক জীবনে এমন অনেকে আছেন যাঁরা গুছিয়ে সংসার করেন। আবার এমন লোকেরও অভাব নেই যাঁরা তা পারেন না। এই দুর্মূল্যের বাজারে জিনিসপত্র কেনাই কঠিন, তারপরে বন্যায় বাজার-দর আগুনছোঁয়া। সমস্ত আনাজপত্র দ্বিগুণ দামে কিনতে হচ্ছে। এই আনাজের সাধারণত যেসব খোসা আমরা ফেলে দিই সেই সব খোসা দিয়ে অনেক উপাদেয় খাদ্য রাঁধা যায়। এ ছাড়া এদের খাদ্যমূল্যও কম নয়। ভিটামিন আবিষ্কারের পর দেখা গেছে অধিকাংশ তরকারির খোসার নিচেই রয়েছে ভিটামিনের আস্তরণ।

পটলের খোসা

প্রথমে পটলের গা থেকে একটু মোটা করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। সেগুলি ধুয়ে জল ঝরতে দিন। এরপর প্রায় ৫০ গ্রাম মত মটর ডাল ভিজতে দিন। ছোট মটর ডাল হলে ভাল হয়। পটলের খোসার পরিমাণ দেখে মাঝে মাঝে মটর ডাল কমাতে বা বাড়াতে পারেন। পটলের খোসা এবং মটর ডাল বেটে একসঙ্গে করুন। নুন দিন। বাটা হলে তাতে কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে দিন। এবার তেল গরম করুন এবং সবসুদ্ধ ছেড়ে দিন। যতক্ষণ না পরস্পর গা থেকে ছেড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। বেশ লাল লাল হলে নামিয়ে কিছু পোস্ত উপর থেকে ছড়িয়ে দিন। এবার পরিবেশন করুন গরম গরম।

লাউয়ের খোসা

একটা মাঝারি সাইজের লাউ কেটে খোসা আলাদা রাখুন। খোসাগুলি জিরিজিরি করে কাটুন, যাতে দেশলাই কাঠির মতন মনে হয়। অর্থাৎ অতটা করে লম্বা হবে এবং সরু হবে। মাঝারি সাইজের দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। কিছু কাঁচালঙ্কা এবং আদা কুচিয়ে মিশিয়ে নিন। নুন দিন। সমস্ত জিনিস একসঙ্গে নিয়ে তিন চামচ আটা দিয়ে মেখে নিন। এবার কড়াতে তেল দিয়ে কিছু লঙ্কা কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে ভেজে নিন। কাটা লাউয়ের খোসায় অল্প জল ছড়িয়ে বেশ মুচমুচে ভাজা হয়ে এলে নামিয়ে পোস্ত ছড়িয়ে দিন।

কুমড়োর খোসা

কুমড়োর খোসা কিছু মোটা করে কাটুন। দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে লাল করে ভেজে রাখুন। তিন চামচ পোস্ত বেটে রাখুন। লঙ্কা এবং আদা কুচিয়ে নিন। এক কোয়া রসুন থেঁতো করে নিন। পরিমাণমত নুন দিন। কড়াতে তেল চাপান। জিরে ফোড়ন দিন। খোসা কিছু ভাজা ভাজা হলে পোস্ত এবং পেঁয়াজ দিয়ে দিন। কাঁচালঙ্কা আদা মিশিয়ে নিন। নাড়তে থাকুন। বেশ ভাজা হলে নামিয়ে নিন।

ছাঁচিকুমড়োর খোসা

কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে নিন। মিহি করে কুচোন। অল্প নুন দিয়ে ভেজে নিন অল্প তেলে, এবার একটা পাত্রে অল্প বেসন গুলুন ঘন করে। বেসনে কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, কালোজিরে, একটু খাবার সোডা দিয়ে ভাজা খোসাগুলো দিয়ে দিন। এরপর কড়াতে তেল দিয়ে বেশ চ্যাপ্টা করে ভাজুন। একপিঠ হলে অন্য পিঠ উল্টাবেন। বেশ মুচমুচে হবে।

নূপুর ভট্টাচার্য

শরীর ও স্বাস্থ্য : ব্যায়াম

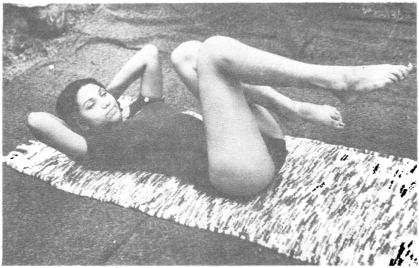
রেবা রক্ষিত

Cycling (সাইক্লিং)

প্রথমে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার শরীরের দু পাশ দিয়ে দু হাত সোজা অবস্থায় তুলে মাথার উপরে মেঝেতে রাখুন। এবার কনুই থেকে হাত দুটো ভাঁজ করে বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ডান হাতের আঙুল ঢুকিয়ে দিন। এবার মেঝে থেকে আট ইঞ্চি উপরে মাথা তুলুন এবং মাথার পেছনে অর্থাৎ ঘাড়ের একটু উপরে হাতের চেটো দুটো চেপে রাখুন। এবার মেঝে থেকে পা দুটো সোজা অবস্থায় তুলে হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটো ভাঁজ করে হাঁটু দুটো বুকের কাছে নিয়ে আসুন। এবার প্রথমে ডান পা সামনের দিকে সোজা অবস্থায় ছুঁড়ুন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে আসুন। ডান হাঁটু বুকের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ পা সামনের দিকে ছুঁড়ুন। এভাবে খুব তাড়াতাড়ি একশ বার করতে হবে অর্থাৎ Cycle-এর Paddle যেভাবে করা হয় ঠিক সেইরকম করতে হবে। আশা করি ছবি দেখে অতি সহজেই করতে পারবেন।

প্রথম প্রথম এক ক্ষেপে কুড়ি বার করে করবেন। কিছুদিন অভ্যাস করার পরে একশ বার করতে সক্ষম হবেন। একশ বার করে দৈনিক তিন ক্ষেপ করতে হবে।

এ ব্যায়ামটি নিয়মিত অভ্যাস করলে তলপেট ও উরুতের চর্বি কমে। এছাড়াও ব্যায়ামটি পেটের উপরিভাগের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।



ফটো : পার্থ রায়চৌধুরী

সাইক্লিং

বিচিত্র বিশ্ব

ফ্যাশনের উপকারিতা

ফ্যাশনের ক্ষেত্রে জিনস আজ সারা বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। শুধু ফ্যাশন হিসেবে নয়, আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা পেতে বা নিম্নাঙ্গে আঘাত পাওয়ার পর বহুক্ষণ সুস্থ থাকতে জিনসের যে একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা জানা গেল ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কখনও কোমরের নিচে আঘাত পেয়ে থাকলে আঁটসাট জিনস পরুন। আঁটসাট জিনস দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ঐ রিপোর্ট থেকেই জানা যায়, পথ দুর্ঘটনায় একটি বাইশ বছরের যুবক তলপেট এবং শ্রোণিদেশে আঘাত পান। দুর্ঘটনা ঘটার পঁচিশ মিনিট পরেও, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরনের জিনস খুলে নেওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শারীরিক অবস্থা একইরকম ছিল। তাঁর পরিধানের জিনস এতই আঁটসাট ছিল যে, সেটিকে কেটে খুলতে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে জিনসটি খুলে নেওয়া হয়, সেই মুহূর্তে দেখা যায় তাঁর দুটি পা এবং তলপেট ফুলতে শুরু করেছে এবং রক্তচাপ হঠাৎই মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। সেই কারণেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত এরকম দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীকে জিনসমুক্ত করা তখনই সংগত কাজ হবে না।

দর্শনীয় কণ্ঠস্বর

অগ্নিশিখার কম্পন দেখে বধিরদের স্বরভঙ্গি নির্দেশ করার যে পদ্ধতিটি এতদিন চালু ছিল তার দিন বোধহয় এবার শেষ হতে চলেছে। তৈরি হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাইক্রো কমপিউটার। এই কমপিউ-টারের পর্দায় বধির তার কণ্ঠস্বর দেখতে পাবে। ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনালেও বাস্তবে কিন্তু তাই সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা প্রায় কিছুই নেই কিন্তু একজন বধির এই কমপিউ-টারের পর্দার উপর প্রতিফলিত কণ্ঠস্বরের পরিবর্তিত প্রতিচ্ছবি দেখে বুঝতে পারবে সে সঠিকভাবে শব্দটি উচ্চারণ করছে কিনা। কারণ তার স্বাভাবিক শ্রবণ অনুভূতি নেই। বিশেষভাবে নির্মিত একটি মাইক্রোফোন কমপিউটারের সংগে যুক্ত থাকে। কোনো বধির সঠিক শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে তার জন্য কমপিউটারের পদার্থ উপহার হিসেবে শুরু হয়ে যাবে একটি সজীব খেলা!

আক্কেল দাঁত

সুইডেনের চিকিৎসকরা নাকি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ! তাঁদের এই ব্যস্ততার জন্য মাঝে মাঝে রোগীরা বিপদে পড়ে যান। কয়েক বছর আগে দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এক ভদ্রমহিলা ছুটে যান জনৈক দাঁতের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারটি তাঁকে বলেন, সাত বছর পরে দেখা করতে; তখন তিনি দাঁতের রোগ সারিয়ে দেবেন। ভদ্রমহিলা মরিয়া হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন এই বলে যে, কেউ যদি তাঁকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেখেন; তাহলে তিনি এগারোশো ডলার পুরস্কার দেবেন। ভদ্রমহিলা নাকি এক বছর পরে ডেট পেয়েছিলেন এক সহৃদয় ডাক্তারের কাছ থেকে!

বাবাদের দাবি

ইংল্যান্ডের ছেলেমেয়ের বাবারা একটি দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে প্রসূতি যেমন কর্মস্থল থেকে ছুটি ভোগ করেন, স্বামীরা কেন তেমন ছুটি পাবেন না? সন্তান জন্মানোর পর তার পরিচর্যার ভার যেমন মায়ের, বাবারও দায়িত্ব তেমন কিছু কম নয়। তাঁদেরও তো নবজাতককে দেখাশোনা করতে হয়। কাজেই তাঁরা কী দোষ করলেন? কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেই কিন্তু এই ছুটি চালু আছে – বেলজিয়ামে দশ দিন, সুইডেনে তিন দিন, ফ্রান্স এবং হল্যান্ডে দু'দিন করে। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পেংগুইন অবশ্য তাঁদের কর্মীদের জন্য এই ছুটির ব্যবস্থা করেছেন।

আশ্চর্য মানবশিশু

বেশ কয়েক বছর আগে বসিরহাটের এক ভদ্রলোকের নবজাতিকা খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। কন্যাটির দুটি মাথা ও চারটি হাত দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। গংগা-যমুনা নামে এই মেয়েটিকে নিয়ে তার অভিভাবক বহু জায়গায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছিলেন। সম্প্রতি এই ধরনের একটি অদ্ভুতদর্শন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে তেজপুর থেকে একশো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে চাঁদ-মারিতে। শিশুটির তিনটি জিভ, একটি ছোট লেজ এবং ঊনত্রিশটি আঙুল রয়েছে। মা এবং সন্তান দুজনেই সুস্থ।

দীপিকা

ত্বক ঃ মুখমন্ডলের ব্যায়াম

ত্বক পরিচর্যায় নিখুঁত ও সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এবং সেই সঙেগ কমনীয় উজ্জ্বলতা লাভের নানাবিধ উপায় ও প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। সর্বদা মনে রাখবেন মুখমন্ডলের ত্বকের স্বাস্থ্য যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারলেই বয়সের হিসেবে যৌবন পেরিয়ে এসেও আপনি যৌবনের পূর্ণ সৌন্দর্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। শরীরের মতোই মুখমন্ডলেরও কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি বয়সের সঙেগ সঙেগ মুখের পেশীসমূহ ও চামড়া ঢিলে হয়ে আসে। ফলে মুখের জায়গায় জায়গায় নানা রেখা ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের ছাপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ত্বকের অযত্ন ও অবহেলা এই বার্ধক্যকে আরো বেশি ত্বরান্বিত ও প্রকট করে। মুখমন্ডলের ব্যায়ামের ফলে আপনার চিবুকের সুগঠিত সৌন্দর্যও অম্লান থাকবে।



(ক)

আপনার বয়স যদি অল্প হয়, অর্থাৎ আপনি যদি কিশোরী বা পরিপূর্ণ যুবতী হন তবে সপ্তাহে একদিন ৫ থেকে ১০ মিনিট ব্যায়ামই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার বয়স যদি আরো কিছু বেশি হয়, যা আসলে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মধ্যবর্তী কোনো সীমা, তাহলে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ব্যায়াম অভ্যাস করা দরকার। এর পরে ৪৫ বছর বা তদূর্ধ্ব হলে প্রত্যেক দিনই ব্যায়াম করা খুবই প্রয়োজন।

নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে পেশীসমূহ দৃঢ় ও ধমনীর রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে বলে আপনার সমস্ত মুখের সুডৌল ভঙ্গিটি অম্লান থেকে তাতে নমনীয় উজ্জ্বলতা জেগে থাকবে। ফলে যৌবন পেরিয়ে এসেও আপনার মুখের যুবতীসুলভ রমণীয় মসৃণ লালিত্য সর্বদাই হয়ে থাকবে অন্যের ঈর্ষার বস্তু। যে কোনো বাজে সময়, যখন আপনার বিশেষ কিছু করার নেই তখন ব্যায়ামগুলো করা আপনার অভ্যাসে পরিণত করে নেবেন।

১। চ্যুইংগাম চিবানোর মতো করে চোয়ালটা অনবরত নাড়াচাড়া করুন। ইচ্ছে করলে প্রকৃত চ্যুইংগাম চিবিয়েও ব্যায়ামটা অভ্যাস করতে পারেন।

২। মুখ সোজা রেখে যতটা সম্ভব বড় হাঁ করুন, হাঁ করা অবস্থায় চোয়াল নামিয়ে আনুন, তারপর মুখটা বন্ধ করুন। এভাবে ক্রমান্বয়ে করুন।



(খ)

৩। গালটা ফুলিয়ে নিন। তারপর, আপনার নাকের সমান্তরালে একটা হালকা পালকের অবস্থান মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে সেটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে আস্তে আস্তে ফুঁ দিন।

প্রতিটি ব্যায়ামই ১৫ থেকে ২০ বার অভ্যাস করা দরকার।

এছাড়া আরো চারটে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়ামের উল্লেখ করছি। ব্যায়ামগুলোর প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি বলে রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝানো হলো।

(ক) মাথা উঁচু করুন, ডানদিকে হেলান, সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে এনে বাঁদিকে নিয়ে যান এবং আবার পেছন দিকে হেলান। এটা আর কিছুই নয়, মাথাটা পুরো বৃত্তাকারে সুশৃঙ্খলিত ভঙ্গিতে অনবরত ঘোরানো।

(খ) কাঁধ সোজা রেখে মাথাটা একবার ডানদিকে ও একবার বাঁদিকে ফেরান। যখন যেদিকে মাথাটা ফেরাবেন চিবুকটা নামিয়ে এনে সেই কাঁধে ছোঁয়াবেন। দেখবেন আপনার মাথার নাড়াচাড়ার সঙেগ সঙেগ আপনার কাঁধদুটোও যেন নড়াচড়া না করে। দু-হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে কাঁধদুটো সুদৃঢ় ও যতটা সম্ভব অনড় রাখুন। ব্যায়ামটা খুব ধীরে ধীরে করবেন, যেন প্রকৃত কোনো ভার ঠেলে মাথাটা একপাশ থেকে আর একপাশে নিতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হলেও কয়েক দিনের অভ্যাসেই সহজ হয়ে যাবে।



(গ)

(গ) সোজা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা যতদূর সম্ভব পেছনে হেলিয়ে দিন এবং আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনুন। এই ব্যায়ামটাও আগেরটির মতো একই পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে অভ্যাস করবেন।

(ঘ) চিবুক থেকে আরম্ভ করে চোয়াল বরাবর মুখের স-মাংস চামড়া ঠিক চিমটি কাটার মতো করে দু-আঙুলে ধরে জোরে জোরে টিপুন।



(ঘ)

প্রতিটি ব্যায়ামই ৩০ বার করে অভ্যাস করবেন। ইতিপূর্বে যে মুখের মালিশের কথা বলা হয়েছে সেই মালিশের শেষে ব্যায়ামগুলো করতে পারলে ভালো হয়। কারণ এই সময় পর্যাপ্ত ক্রীমের প্রলেপ সহ আপনার সমগ্র মুখমন্ডল ব্যায়ামের পক্ষে উপযুক্ত থাকে। না হলেও ব্যায়ামের আগে মুখে খানিকটা ক্রীম ভালো করে মেখে নেবেন। সবশেষে তোয়ালের ন্যাপকিন বা রুমাল গরম জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখে প্রথমে খানিকটা সেক দিয়ে পরে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিলে অতিরিক্ত সুফল পাবেন। এটা অবশ্য অন্য সময়ও করতে পারেন, তাতেও উপকার পাবেন।

• চিত্ররথ দত্ত

[আমেরিকায় মেয়েরা ঃ ৬ পাতার পর]
গেলে তাকে গ্রহণ করা হয় না। এই নিয়ম-কানুন আমাদের দেশেও আছে। দু'দেশের সাংস্কৃতিক প্রভেদের জন্য নিয়মগুলো আলাদা কিন্তু দু'জায়গায়ই নিয়মগুলো তৈরি করেছে পুরুষেরা। ভারতে মেয়েদের বলা হচ্ছে, 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, ভাগ্যের প্রতীক' আর ওখানে বলে 'মেয়েরা আনন্দের সামগ্রী'। দু' দেশেই কিন্তু মেয়েরা এটা মেনে নিয়েই চলছে।

আমেরিকার গণতন্ত্রের ছবিতে শুধু পুরুষদেরই ভিড়। পুরুষরাই শাসন করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে, গঠনমূলক কাজ করছে। রাজনীতির কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলারা আজও অনুপস্থিত। প্রথম সারির মহিলা বলতে রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী! তাই উপ-রাষ্ট্রপতি পদে জেরালডিনের মনোনয়নই এই দেশে ঐতিহাসিক।

সংসার জীবনের ওপরে আমেরিকাও জোর দেয়, যেখানে মেয়েদের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় গৃহিণী, মা, প্রতিপালক হিসাবে। তা সত্ত্বেও সমস্যাটা থেকেই যায়। ডিভোর্স, কুমারী মা, বহুবিবাহ এ দেশেই সবচেয়ে বেশি। একাকিত্বের সমস্যায় ভোগেন অধিকাংশ আমেরিকান এবং প্রতি বছরই বহু সংখ্যক লোক মনোবিজ্ঞানীর কাছে ছোটেন। যে কোনো বাড়িতেই বাবা-মা ছেলেমেয়ের পরস্পরের প্রতি আচরণ সুখী গৃহের পরিপন্থী। সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বাবা-মা ছেলেমেয়েকে বড় হতে সাহায্য করলেও কেউ কারুর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, উপরন্তু ছেলেমেয়েকে আলাদাভাবে নিজের মতন থাকার উৎসাহ দেওয়া হয়। টিভিতে প্রায়ই কোনো নাটকে বা সিনেমায় দেখা যায় কোনো মার হতাশা, যখন সে শোনে যে তার ১৮ বছরের মেয়ে থাকার জায়গা না পেয়ে তার সঙ্গে থাকতে আসছে। বলা বাহুল্য মা একাই একটা বড় বাড়িতে থাকে। আমি জানি এক শহরে থেকেও বহু ছেলেমেয়ে বাবা-মার থেকে আলাদা থাকে। অনেকে হয়ত বলবেন এটা ভালই, যুবক-যুবতীর স্বাধীনতা অর্জন এবং আত্মোপলব্ধির জন্য এর প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে যা বলতে চাইছি তা হল বাবা-মার ভূমিকার কথা, বিশেষত মার। এটা খুবই আশ্চর্যের নয় কি যে বাবা-মা নিজের সন্তানকে বোঝা মনে করেন এবং তারা দূরে থাকলেই খুশি হন।

আবার অপরদিকে বৃদ্ধ বাবা-মা কখনোই ছেলেমেয়ের কাছে আশ্রয় চান না। সন্তানরাও বৃদ্ধ বাবা-মাকে বোঝা মনে করেন। কারণ ওই সময় বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণ, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর দায়িত্বই তাকে নিতে হবে, এমনকি কখনো কখনো সঙ্গও দিতে হবে। আমার আট বছর আমেরিকার প্রবাস জীবনে আমি একজনকেও দেখিনি যিনি এই সমস্যায় বিব্রত বোধ করেন না। অনেক সময়ই তাঁরা স্পষ্টই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ওপর এখানে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয় সাংসারিক জীবনে। এখানে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি সবই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা হয়ত এই কারণেই যে এরা অন্য কোনো ভালবাসার সম্পর্ক ভাবতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় ডিভোর্স, বিচ্ছেদ এসব এখনও এত বেশি যে নারী-পুরুষের এই সম্পর্কের ওপরও আস্থা রাখা যাচ্ছে না।

আমেরিকান মহিলাদের বোধহয় সবচেয়ে ভালভাবে চিহ্নিত করা যায় 'অন্য নারী' হিসাবে। তবে নারী আন্দোলনের ফলে মহিলাদের সচেতনতা বাড়ছে এবং তাঁরা সমাজ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন এটাই আশার কথা।

কমল জি. বি. সিংহ

জাতীয় অনুষ্ঠানে রাত ৯-৫০ এ ঘড়ির কাঁটা ছুঁতে না ছুঁতেই সংবাদের একঘেয়ে, বিরক্তিকর সিগনেচার টিউনটি কানে এসে বাজে এবং সুপরিচিত দূরদর্শনের প্রতীক চিহ্নটি থমকে, থমকে টি. ভি.র পর্দার উপর নেচে নেচে পার হয়ে যায় আপনার অজান্তেই। আর যদি আপনার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন থাকে তো টি. ভি.র পর্দায় কমল জি. বি. সিংহের উষ্ণ সান্নিধ্য আপনার ঘরটাকে মধুর আমেজে ভরিয়ে তুলবে। পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সবার অজান্তে হয়তো মুখ থেকে উঃ, আঃ প্রভৃতি প্রশংসাসূচক উক্তি বেরিয়ে পড়ে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সংবাদ পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কমল ও সালমার জুড়ি অধিকাংশ দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত একান্ত সাক্ষাৎকারে কমলদেবী তাঁর দূরদর্শনের খবর পড়ার আগে ও পরের জীবনের কিছু কথা জানালেন –

ওনার প্রথম অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করলেন, বললেন 'আমি রেডিওর যুববাণীতে শুরু করি। আমার মনে হয় রেডিও একটি মস্ত বড় শিক্ষাক্ষেত্র – অন্তত আমার কাছে, খুব মজার। পঠন-প্রণালীর ব্যাপারে বিশেষ কোন কড়াকড়ি ছিল না। আমার কাজের উপর বিশেষ হস্তক্ষেপ ছিল না। আমি সংগীত, কথিকা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম ও পরে আমি আরও সম্মানজনক দিল্লির 'খ'-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিই।

'দূরদর্শনের খবর পড়াটা নিতান্তই আকস্মিক। ১৯৭৭ সালে আমার এক বন্ধু আমাকে দূরদর্শনের ঘোষিকার জন্য অডিশন দেবার আমন্ত্রণ জানায়। আমি নির্বাচিত হই এবং কিছুদিনের মধ্যেই মিরর অফ দি ওয়ার্লড শীর্ষক অনুষ্ঠানটির ঘোষিকা হিসাবে মনোনীত হই। কিন্তু আমি অরাজী হইনি কারণ সত্যি সত্যিই এটা আমার ভাল লাগেনি।

'আমি কখনোই খুঁতখুঁতে বা উন্নাসিক নই, কিন্তু আমি মনে করি যে সংবাদ পড়া সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ। যাই হোক ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো আমার, শীঘ্রই দূরদর্শনের একজন সংবাদ পাঠিকার দরকার হলো। আমাদের কয়েকজনকে অডিশনেও ডাকা হলো এবং আমি নির্বাচিত হই।'

– এইভাবে একটি তারকার উদয় হলো। আচ্ছা বেতারশিল্পী হিসাবে দূরদর্শনের ক্যামেরায় কি আপনার নিজস্ব স্টাইলের কোন পরিবর্তন ঘটেছিল? আপনি কি নার্ভাস বোধ করতেন?

– 'নিশ্চয়ই। সত্যি বলতে কি নার্ভাসনেস এবং নিজস্ব জড়তার জন্যে আমার প্রথম অনুষ্ঠানের দিনটা বেশ কয়েকবার পিছিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার পড়ার ব্যাপারে খুব নিশ্চিত ছিলাম। এর জন্য আকাশবাণীকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ক্যামেরার সংগে খাপ খাওয়াতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই এইটা আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আজও আমি ক্যামেরার সামনে সহজ হতে পারি না, আমার এখনও কিছুটা জড়তা রয়ে গেছে।'

তখনই কমলদেবী বলতে শুরু করলেন নবাগতদের জন্য কি কি করা উচিত এবং যেগুলি তিনি তাঁর প্রথমদিকে কাজে লাগাতে পারতেন তিনি বললেন – 'আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে সরাসরি আসবার আগে বেশ কিছুটা প্রশিক্ষণ ও সঠিক মানসিকতা তৈরি করে নেওয়া দরকার। ১৯৭৭ সালে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি মনে পড়ে। তখন আমরা সবাই আনকোরা নতুন ছিলাম এবং আমাদের শুধুমাত্র খান দুয়েক সংবাদ বুলেটিন দেখানো হয়। কল্পনা করতে পারেন? আমাদের কি শুরু থেকে মেক আপ ও সংবাদ পরিবেশন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালভাবে পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়? বেতারশিল্পী হিসাবে আমার কখনো কখনো বেশি বলা হয়ে যেত। এইটা বেতারের পক্ষে খুব ভাল, কিন্তু দূরদর্শনের ক্ষেত্রে নয়। কারণ এখানে ছবির প্রাধান্যটাই বেশি দেওয়া হয়।'



এইবার মেক আপের কথায় বললেন – 'প্রথম কয়েকটি অনুষ্ঠানে নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কুৎসিত না দেখিয়ে মেক আপ শিল্পীদের দিয়ে সংবাদ পাঠিকাদের টি. ভি.র পর্দায় আসবার আগে ঠিকভাবে প্রস্তুত করে দেওয়াটা কি উচিত নয়? এ ছাড়া সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে যান্ত্রিক কলাকৌশল-গুলির সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন – কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়, কিভাবে সম্পাদনা করা হয় ও পরিবেশনা করা হয়, আমাদের বিভিন্ন মিটিংয়ে আমরা এই সমস্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরেছি এবং বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অফ মাস কমিউনি-কেশন-এ একটা ট্রেনিং কোর্স চালু করার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যদিও অনেক দেরী হয়ে গেছে, তবুও আমি মনে করি এতে ভাল হবে।'

এবার আমরা সংবাদ পাঠকের নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম। দিল্লি দূরদর্শনের কি কোন নির্দিষ্ট বিচারের মাপদণ্ড ছিল?

– 'ঠিক জানি না।' উনি হাসিমুখে স্বীকার করলেন – 'কারণ আমি কখনও নির্বাচক মণ্ডলীতে ছিলাম না। কিন্তু আমার মনে হয় নিশ্চয়ই একটা মোটামুটি মান নির্ধারিত করা আছে।'

একটু ভেবে বললেন – 'স্পষ্ট উচ্চারণ, সহজ বাচনভঙ্গী এবং সুশ্রী চেহারার প্রয়োজন। যদিও আমি মনে করি খুব সুদর্শনা সংবাদ-পাঠিকা হলে খুব দারুণ হয়।'

– আমি বিরোধিতা করলাম, বললাম তাতে খবরের প্রাধান্য খর্ব হয়। কিন্তু কমলদেবী মিষ্টি হেসে তাঁর অসম্মতি জানালেন এবং আমার উক্তিকে 'পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি' বলে মন্তব্য করলেন।

– প্রায় অর্ধ দশক খবর পড়ার ফলে আপনার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখছেন?

– 'ওঃ, আমার পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা খুবই সমালোচনা করে, মা সর্বদাই শাড়ীর ভাঁজগুলির ব্যাপারে অভিযোগ করে আর বাবা আমার নজর এড়িয়ে যাওয়া ভুল ধরিয়ে দেন। কিন্তু সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আসে অপরিচিতদের থেকে। যেমন সেদিন একটা অটো করে বাড়ি ফিরছিলাম। চালক কিছুতেই ভাড়া নিতে চাইছিল না। সে জিজ্ঞাসা করলো 'আপ নিউজ পড়্তী। হ্যায়, না?' আমি শেষে জোর করে তাকে ভাড়া দিলাম। ঘোরাঘুরির সময়, কেনাকাটার সময় এই সব টুকরো টুকরো ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। এইটা একটা সুন্দর অনুভূতি যা আমাকে খুব আনন্দ দেয়।'

– বিজ্ঞাপন জগৎ থেকে আপনার প্রতি প্রতিক্রিয়া কি রকম?

– 'বেশির ভাগই মডেলিং, আমি মডেলিং-এ প্রচুর অফার পাই, কিন্তু আমার ভাল লাগে না। অবশ্য একবার এক মক্কেলের জন্য আমি একটা কাজ করেছিলাম। কারণ সে তার টি. ভি. বিক্রি বাড়াতে কোন দূরদর্শনের কর্মীকে চাইছিল। কিন্তু আমি আর করিনি।'

– জিজ্ঞাসা করি কোন সিনেমায়?

– 'ওঃ আমি জীবন ধারণের জন্য অভিনয় করতে পারি না। এছাড়া আমার থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নেই এবং সবার উপরে আমি হিন্দিতে খুবই দুর্বল।'

– সমসাময়িক নামকরা চিত্র পরিচালকদের যথা অপর্ণা, সাই, নিহালনি, বেনেগাল প্রভৃতি কারও কাছ থেকে ডাক পেলে, তার প্রতিক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলাম।

– 'আমি এই ব্যাপার একেবারে উড়িয়ে দিই না, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই শিল্পসম্মত, অর্থপূর্ণ এবং যথোপযুক্ত হওয়া চাই। কোন কমার্শিয়াল হলে চলবে না। এইটা সুনিশ্চিত।'

একটু হেসে কমল জি. বি সিংহ বললেন – 'যেমন চলছে তাতে আমি খুবই সুখী, আমার একটি মডেলিং এজেন্সী ও রেকর্ডিং স্টুডিও আছে, এবং এই কিছুদিন হলো ভি. ডি. ও ফিল্ম প্রযোজনার কাজে হাত দিয়েছি। এছাড়া খবর পড়া তো আছেই।

কমলদেবী একটু থেমে বললেন – 'একটি মেয়ের পক্ষে এতগুলো কাজ কি যথেষ্ট নয়?'

মনোজিৎ লাহিড়ী

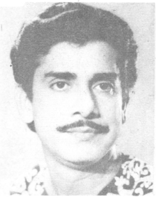


স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি

বত্রিশ বছরের তরুণ শক্তিব্রত দাস বাইশ বছর বয়সেও জানতেন না একদিন তিনি সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি পাবেন। গান ভালবাসেন, যেমন ভালবাসেন ছবি আঁকা, কিন্তু তখনো তিনি ভিড়ে মিশে থাকা একজন শ্রোতা বা দর্শক মাত্র। কোনদিন তাঁর নাম রেডিও, টিভিতে ঘোষিত হবে, তাঁর গানের রেকর্ড, ক্যাসেট বিক্রি হবে বাজারে, কিংবা প্রেক্ষাগৃহে তাঁর গান শোনার জন্যই অপেক্ষা করবে কিছু মানুষ – সত্যি কথা বলতে কি, একযুগ আগেও শক্তিব্রত এসব কল্পনাই করতে পারেননি। যদিও ছবি এবং গান এ দুটোর প্রতিই শক্তিব্রতর অনুরাগ কিছুটা জন্মসূত্রে। একালের শ্রোতারা হয়তো জানেন না, শক্তিব্রতর বাবা সন্তোষকুমার দাস সেকালের টুইন কোম্পানি থেকে গোটা তিন-চার রেকর্ড করেছিলেন স্বদেশী গানের, ছবি আঁকাও ছিল তাঁর নেশা। বাবার কথা বলতে গিয়ে শক্তিব্রত জানান, 'আমাদের পরিবারের কয়েক পুরুষ ধরেই ছিল ওকালতির ব্যবসা, বাবার ঠাকুরদা গোরাচাঁদ দাস ছিলেন সেকালের ডাকসাইটে উকিল। সেই সূত্রে বাবাও ওকালতি করতেন, গান-বাজনার চর্চা করতেন লুকিয়ে। প্রথম সেটা জানাজানি হয়ে যায় বাসরঘরে। আইনজীবীর পরিবারে সেই প্রথম গানের স্বীকৃতি।

সেই স্বীকৃতিতে সন্তোষকুমার স্বস্তি পেয়েছিলেন ঠিকই, এবং পরবর্তীকালে স্ত্রী রমা দেবীর উস্কানিতে সুরের জগতে অনেকটা ডুবও দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাংসারিক টানা-পোড়েনে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে পারেননি। এর একটি প্রধান কারণ, দেশবিভাগ। বরিশালের কয়েক পুরুষের বাস্তু-ভিটা ফেলে তাঁকে তাঁর সংসার নিয়ে চলে আসতে হয় এই কলকাতায় – আক্ষরিক অর্থেই নিঃস্ব উদ্বাস্তু হয়ে। একটি পরিবারের পুনর্বহালের এই সমস্যা ও সংগ্রামের মধ্যেই শক্তিব্রতর জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা। সংগত কারণেই ছাত্রজীবনে তাঁকে 'রোজগেরে মানুষ' হবার দিকে মন রাখতে হয়, শিল্পী হবার স্বপন তখন দূরঅস্ত। সেন্ট লরেন্সের স্কুল জীবন পেরিয়ে শক্তিব্রত ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্সে। সেখানে ক্লাসের ভেতর বন্ধুদের মনোরঞ্জনী গান শোনাতে শোনাতে একদিন অনুরুদ্ধ হন সরস্বতী পূজো উপলক্ষে একটি বিনোদন অনুষ্ঠানে শিল্পী হিসেবে নাম লেখাবার জন্যে। শক্তিব্রত পড়লেন মহা ফাঁপরে। বাজার চলতি হিট গানগুলো গলায় তুলে নিয়ে যখন তখন গেয়ে দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু যাকে বলে সুরের রেওয়াজ, তা তো তাঁর একেবারে নেই। নিদেনপক্ষে হারমোনিয়ামটাও বাজাতে শেখেননি। এই অবস্থায় বাড়ি ফিরে বাবার হাতেপায়ে ধরলেন, 'একসময় তো আপনি নিয়মিত গান করতেন, আমাকে কিছু একটু শিখিয়ে দিন না।'

ছেলের এই আবদার উপেক্ষা করতে পারেননি সন্তোষকুমার। বরং এক নস্টালজিয়ায় বিদ্ধ হয়ে নিজের হারানো দিনের কয়েকটি গান সস্নেহে তুলে দিলেন আত্মজের কণ্ঠে। সেই শুরু। গান আর তখন শুধু অবসরের জন্যে নয়, গানের জন্যেও কিছু অবসর খুঁজতে লাগলেন শক্তিব্রত। পড়াশুনো, কলেজ, আড্ডা সব ছাপিয়ে মন পড়ে থাকে হারমোনিয়ামে, এতদিনের সাধারণ অনুরাগটাই ক্রমশ



শক্তিব্রত দাস

দানা বাঁধতে থাকে মনের ভেতর – যে করেই হোক, যাই করুন না কেন, গানটা তাঁকে ভাল করে শিখতে হবে। এমনিতে শক্তিব্রত একদিকে যেমন বিনয়ী এবং ভদ্র, তেমনি অন্যদিকে বাকপটু ও সপ্রতিভ। তাই তিনি বুঝেছিলেন, নিজের মনের কথা নিজেকেই উচ্চারণ করতে হবে সকলের কাছে। যেমন, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে, রবীন্দ্র-সদন আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান গাইবার ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। সেই ইচ্ছার কথা নিজেই গিয়ে জানান রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রথমে কিছুটা উপেক্ষা জুটলেও পরে সুযোগ পেয়ে যান। একটি অনুষ্ঠানে সুমিত্রা সেনের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সরাসরি যোগাযোগ করেন শিল্পীর সংগে, আবদার, গান শেখাতে হবে। সুমিত্রা সেন সাধারণত ছেলেদের গান শেখান না, কিন্তু শক্তিব্রতর আগ্রহ পাছে উপেক্ষিত হয় তাই তিনি এই অর্বাচীন ছেলেটিকে কিছুটা প্রশ্রয় দেন, এবং অচিরেই সুযোগ করে দেন ত্রিবেণীর হয়ে গান গাইবার জন্যে। সেখানে তখন যাঁরা ছিলেন শক্তিব্রতর সহশিল্পী তাঁদের অনেকের একটু প্রশংসা একটু উৎসাহ একজন নবীন শিল্পীর বর্তে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী অলকনন্দার নাচের সংগে শক্তিব্রত একটি গান গেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সকলেই বলাবলি করল, বেশ গলা তো ছেলেটির। তখনো ত্রিবেণীর সকলে নবীন এই শিল্পীর নামটিও জানে না। এই অবস্থায় যখন সরাসরি প্রশংসা আসে সাগর সেনের মত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কাছ থেকে তখন শক্তিব্রত শুধু আনন্দ নয়, আত্মবিশ্বাসের ভূমিটিও খুঁজে পান। আত্মবিকাশের প্রথম সোপান এইভাবেই পেরিয়ে আসেন তিনি।

এরপর অনেকের কাছেই শিক্ষা নিয়েছেন শক্তিব্রত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ধীরেন বসু, সুকুমার মিত্র, অসীমা মুখোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এখন ক্ল্যাসিকাল চর্চা করছেন রতনলাল ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে। কথায় কথায় শক্তিব্রত এইসংগে তাঁর পারিবারিক সহমর্মিতার কথাও স্মরণ করে জানান, কলেজে পড়তে পড়তে গানের নেশা যখন তাঁকে ভীষণভাবে পেয়ে বসল, বলাই বাহুল্য সংসারের আর্থিক অবস্থা তখনো বিশেষ সুবিধার নয়, কিন্তু কেউই তাঁকে বাধা দেননি। রেডিওয় অডিশন দিয়ে শক্তি যখন প্রথম গান গাইবার সুযোগ পেলেন দাদা দেবব্রত তখন সবে চাকরি পেয়েছেন। তিনি প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই বাড়িতে নিয়ে এলেন তানপুরা। এসব ঘটনা শক্তিব্রতকে খুবই উদ্বুদ্ধ করেছে।

কমার্স-গ্র্যাজুয়েট শক্তিব্রত এর কিছু পরে নিজেই চাকরি পান একটি ব্যাংকে। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে প্রমোশন নেবার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে শক্তিব্রতর আগ্রহ কম, পাছে কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হয়। স্ত্রী মধুশ্রীও শক্তিব্রতকে বড় অফিসার নয়, আগামী দিনে বড় শিল্পী হিসেবে পেতে চান।

রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুল-প্রসাদ, রজনীকান্ত ও আধুনিক ইত্যাদি নানান ধরনের গানে আগ্রহ থাকলেও এ পর্যন্ত শক্তিব্রতর যে দুটি রেকর্ড ইনরেকো থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা রজনীকান্ত সেনের নির্বাচিত আটটি গানের। মর্ম ও মাধুর্যে সুগীত এই গানগুলি শক্তিব্রতর পরিচিতি বাড়াতে অনেকটা সাহায্য করবে বলে এই প্রতিবেদকের বিশ্বাস।

রানা দাস

দীপংকর যেখানে দাঁড়িয়ে

উনিশশো একাত্তর সালের দুর্গাপুজোয় দীপংকর দে'র প্রথম ছবি রিলিজ করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ'। বয়স তখন কতই বা! টেনেটুনে ছাব্বিশ বছর। চার-পাঁচ বছর গড়াতে না গড়াতেই হয়ে উঠলেন একটি তুমুল নাম। ষাট দশকের গোড়া থেকে যদি হিসেব করি, উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরই বাংলা ছবির নায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি, জনপ্রিয়তা।

এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও দারুণ দেখতে দীপংকরকে। হাইট ছয় ফুট পেরিয়েও ইঞ্চিখানেক। চোখে হাল ফ্যাশন-এর বাহারি চশমা। চমৎকার গলার স্বর। কথা বলেন হুড়মুড় করে, সোজাসুজি।

কথার শুরুতেই দীপংকর বললেন, 'উঁচু দরের ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল-এর অ্যাকটর হিসাবে আমাকে দাঁড় করাবেন না। আমি সেটা নই। অ্যাভারেজ মিডিওকার অ্যাকটর। খারাপের থেকে একটু ওপরে – উইথ এ শেড অব গুডনেস! তবু আমার যতটা পোটেন-শিয়ালিটি, ব্যবহার করতে পারেনি টালিগঞ্জ। চোদ্দ বছরে ক-টা ভালো ছবি করতে পেরেছি? যে ধরনের রোল চেয়েছি, বড় একটা জোটেনি।' ওই ক-টা কথাতেই মানুষটাকে অনেক দূর পর্যন্ত বোঝা গেল।

'সিনেমার হিরো হবার মতলব ছেলেবেলা থেকেই?'

'কলেজ লাইফে বছর দুয়েক অসীম চক্রবর্তীর 'চতুর্মুখ' গোষ্ঠীতে ভিড়েছিলাম, দু-চারটে নাটকে ছোটখাটো রোলও করেছি, কিন্তু ছেলেবেলার অ্যামবিশন ছিল কলেজে মাস্টারি করব। একষট্টি সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে সায়ান্স গ্রুপে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন, শেষে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম। ইকনমিক্স অনার্স। এম এ ফাইনাল দেবার মুখে, কী ভূত চাপল মাথায়, লেখাপড়া শিকেয় তুলে মোটরগাড়ির ফিল্টার বিক্রি করতে লেগে গেলাম। সেলসম্যান-এর চাকরি। মাসে একশো পঁচাত্তর টাকা মাইনে। সাতষট্টি সালের গোড়া থেকে বাহাত্তরের শেষাশেষি, ছয় বছরে, কখনো সেলস্, কখনো অ্যাডভারটাইজিং-এর চাকরি করলাম সাত-আটটা কোমপানিতে।'

'সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ কিভাবে?'

'সত্তর সালের শেষদিকে, কী খেয়াল হলো, সত্যজিৎ রায়কে ফোন করলাম একদিন। নিজের পরিচয় দিয়ে বলে বসলাম, 'আপনার ছবিতে কাজ করব।' কী আশ্চর্য, পরের দিন বাড়িতে যেতে বললেন! মানিকদা তখন শংকরের উপন্যাস থেকে 'সীমাবদ্ধ' ছবি করছেন। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, প্রাথমিক আলাপের পর বললেন, 'ছোট্ট একটা রোল আছে। যে কোম্পানীকে ঘিরে ছবির গপ্পো, সেই 'হিন্দুস্থান পিটার্স'-এর অ্যাড এক্সিকিউটিভ মিঠু সেনের চরিত্র। তিন দিনের



'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে দীপংকর দে

কাজ। চলবে?' আহ্লাদে গলে গেলাম!'

'তিনদিনের ছোট্ট কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?'

'শুটিং-এর সময় টেরই পেলাম না কিছু। ক্যাজুয়ালি সব কিছু করিয়ে নিলেন মানিকদা। নিজের কাজের বাইরেও, ফুরসৎ পেলেই শুটিং দেখতে যেতাম। মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।'

'শখের অভিনয় শেষ পর্যন্ত পেশা হয়ে গেল?'

'আমাদের পারিবারিক বন্ধু জয়ন্ত ভট্টাচার্য ছিলেন অগ্রগামী পরিচালক গোষ্ঠীর কো-ডিরেকটর। বাহাত্তর সালের পুজোর ঠিক পরেই জয়ন্তদা হঠাৎ বললেন, 'টিটো, সিনেমার হিরো হবি? অমুক দিন অমুক সময়ে সাতাশি নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে চলে আয়। রঞ্জিতমল কাংকারিয়ার অফিস।' ওখানে দুজন ডিরেকটর আমাকে দেখলেন। স্বদেশ সরকার এবং অগ্রগামী-র সরোজ দে। একই সঙ্গে 'হারায়ে খুজি' আর 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবি দুটোয় নায়কের ভূমিকায় সিলেকটেড হলাম। শুটিং-এর জন্য ছুটির দরখাস্ত করলাম অফিসে। ছুটি দিলো না। চাকরি ছেড়ে-ছুড়ে ফিল্মকেই পেশা করব বলে চলে এলাম!'

'সে কী! এত সাহস?'

'আমি বরাবরই সাহসী ছেলে। লাইফ-এর সব ডিসিশনই এমনভাবে নিই। কখনো পেছোই না কোনো ব্যাপারে। কোনো কাজ করতে গিয়ে দু-বার ভাবি না। যদি ভাবি এটা করব, করবই। বছরখানেক চুটিয়ে প্রেম করে ততদিনে বিয়েও করে ফেলেছি দিল্লিনিবাসী, আগ্রাওয়ালি বাপ্পিকে। বড় মেয়ে তানিয়ার বয়স তখন বছর দেড়েক!'

'নায়কের ভূমিকা কেমন লাগল?'

'দুটো ছবিরই কাজ শুরু হলো প্রায় একই সঙ্গে। ভীষণ ভালো লাগছিল। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! নিজে কিছু একটা করছি। পাঁচজন দেখবেন। ভালো-মন্দ নিয়ে কথা হবে। কীরকম ঘোরের মধ্যে কাটছিল! অবিশ্যি 'হারায়ে খুঁজি'র চেয়ে হাজার গুণ ভালো ছবি 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'। রমাপদ চৌধুরীর গল্পটাই অসাধারণ। কালুদা, মানে সরোজ দে-ও বড় মাপের পরিচালক। অসম্ভব খুঁতখুঁতে মানুষ। এককেটা শট্ আট-দশ-বারোবার করেও টেক করলেন। প্রচণ্ড খাটলাম সবাই। প্রায় দু-বছর ধরে। আগাগোড়া আন্ডার অ্যাকটিং করতে হলো। এবং বয়স বাড়িয়ে। কাবেরী বসুর থেকে বয়সে তো আমি অনেক ছোট।'

'একটা চুম্বনের দৃশ্য ছিল 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবিতে। আপনি তখন নতুন, কাবেরী বসু অত সিনিয়র অভিনেত্রী – অসুবিধে হলো না?'

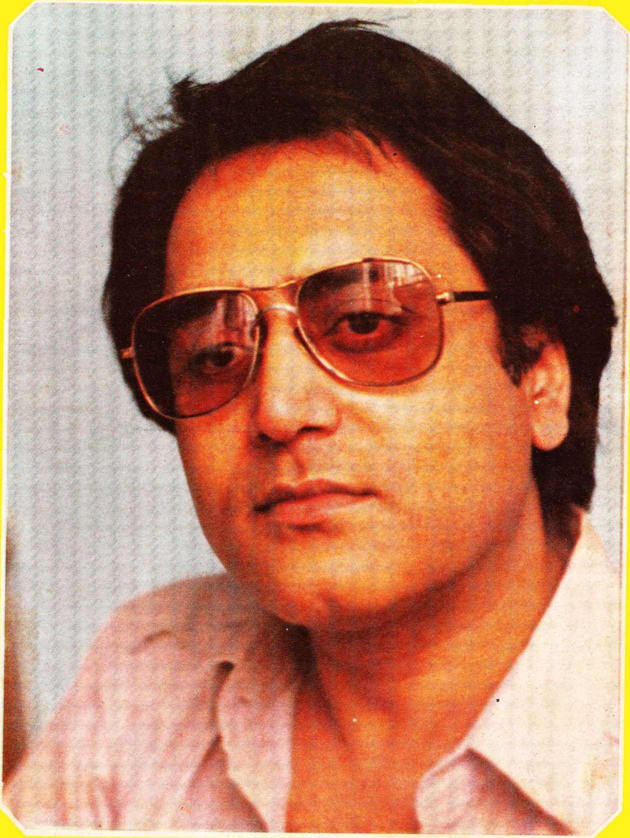
'চুমুর দৃশ্যের শুটিং-এর আগে কাবেরীর সঙ্গে এক বছর কাজ করা হয়ে গেছে। খুব ক্লোজ হয়ে গেছি আমরা। সহজভাবেই উতরে গেল ব্যাপারটা। ডিরেকট কিসিং শট। টেক্ করা হয়েছিল নদীর জলের রিফ্লেকশনে। ছবিটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, বাংলা ছবির জগতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ......

প্রাপ্তমনস্ক একটা ছবি হচ্ছে! অনুপম ও অঞ্জলি ছেলেবেলায় উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত। ওদের কখনো আলাপ হয়নি, শুধু দেখেই দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল। নিজের বিয়ের দিনেও অনুপমের জন্য চোখের জল ফেলেছিল অঞ্জলি। কুড়ি বছর পর নির্জন মুসাবনি হলুদপুকুরে ওদের দেখা হয়ে গেল আচমকা। শুধু আলাপই নয়, দুই পরিবারের মধ্যে সখ্যতা হলো। চাগিয়ে উঠল ছেলেবেলার প্রেম, বারে বারে স্মৃতির মধ্যে ডুব দিতে চাইল দুজনেই। এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে...... এখন আর প্লেটোনিক লাভ-এর বয়স নেই। ইট'স বাউন্ড টু বিকাম ফিজিক্যাল অ্যাট এ স্টেজ। শুধুই প্রেমের গপ্পো-গুজব করে গেলে মানাতো না বুড়ো-বুড়িকে।'

'কোনো প্রিপারেশন ছিল না। ফিল্ম অ্যাকটিং রপ্ত করলেন কিভাবে?'

'কে বলল, রপ্ত করেছি? ফিল্ম অ্যাকটিং-এর কিস্যু জানি না। আমি নর্মাল অ্যাকটিং করি। আই ট্রাই টু বিহেভ। কখনো কোনো চরিত্রে ফোর্স অ্যাকটিং করি না। খাজা ছবি কম করিনি। কিন্তু অবাস্তব চরিত্রকে ফোটাতে

দীপঙ্কর দে   ফটো : রাহুল মজুমদার



গিয়েও নর্মাল হতে চেষ্টা করি।'

'কিভাবে তৈরি করেন একটা চরিত্রকে?'

'চরিত্রটাকে ভাবি। তার সোস্যাল, ইকনমিক্যাল, পলিটিক্যাল, কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড। সব মিলিয়ে চরিত্রটা দানা বাঁধে মনের ভেতর। তারপর পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ। ভালো পরিচালক হলে টোটালি সারেন্ডার করি। গোলা পরিচালকদের ক্ষেত্রে তাঁর যদি কোনো ভাবনা থাকে, জেনে নিয়ে, প্রয়োজন হলে সেই ভাবনাটা আমার ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে, চরিত্রটাকে দাঁড় করাই। অ্যাক্ট করি না। আই ট্রাই টু বিকাম দ্যাট। এইভাবে যা বেরোয়। খাজা চিত্রনাট্য হলে বেরোয় না!'

'কোন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে সবচেয়ে ভালো লাগে?'

'সিরিয়াস। যে মানুষের জীবনে অনেক কনট্র্যাডিকশনস আছে। সেগুলো খুব চাপা, নিজের ভেতরে। মেনলি ইনট্রোভার্ট ক্যারেকটরস। সাইকোলজিক্যাল ক্যারেকটরস।'

'বাংলা ছবিতে সাধারণত যে স্টাইল-এর অভিনয় হয় যে ট্র্যাডিশন, সে বিষয়ে আপনার কি ধারণা?'

'বেশিরভাগ বাংলা ছবিতে ফিল্ম অ্যাকটিং হয় না। দু-চারজন পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া বাকিরা ফিল্ম অ্যাকটিং-এর মূল ব্যাপারটাই জানেন না! চড়া সুরের অভিনয়টাই টালিগঞ্জে ভালো অভিনয় বলে চলে। আমি ওই লাউড অ্যাকটিং-এর বিপদটাকে সবচেয়ে ভয় করি। সিনেমায় যাত্রা করার ওই ট্র্যাডিশনটাই বাংলা ছবিকে বড় হতে দিলো না!'

'যে সব অভিনেতাদের সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কাকে কাকে দুর্ধর্ষ বলে মনে হয়েছে?'

'উৎপল দত্ত এবং রবি ঘোষ অসাধারণ। সাংঘাতিক পোটেনশিয়ালিটি দুজনেরই। উৎপলদার টাইমিং সেন্স, পেসিং, সংলাপ উচ্চারণে কণ্ঠাভিনয়ের ব্যবহার অতুলনীয়। রবিদার অভিনয়ের প্রধান উপাদান হলো ডিসিপ্লিন, পরিমিতিবোধ। তাঁর চোখ দুটোও কথা বলে। হাত-পা বেঁধে দিলেও চোখে অ্যাকটিং করে দেবেন! কিছু কিছু ম্যানারিজম থাকলেও, অনিল চট্টোপাধ্যায়ও আমার প্রিয় অভিনেতা। ভেবে-চিন্তে পার্ট করেন। বিমল দেবও দারুণ। সিনেমার মাপে অভিনয় করেন। ক্যারেকটরাইজেশনগুলো রিয়েল হয়।'

'অভিনেত্রীদের মধ্যে?'

'অপর্ণা সেনের তুলনা তিনি নিজেই। না ভেবে অভিনয় তো করেনই না, বরং চরিত্রগুলোর মধ্যে কালারস ইন্ট্রোডিউস করেন – অ্যাপার্ট ফ্রম ডিরেকটরস। অমন ঝকঝকে, অনাড়ম্বর, বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। চেহারার ডিফেক্টস ওভারকাম করে শ্রীলা মজুমদার এমন এক ধরনের নিচু পর্দার অভিনয় করেন...... ওঁর অভিনয়ের মধ্যে বডি আছে। জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে চরিত্রগুলোকে ফোটাতে পারে। অকারণে ন্যাকামো করে না। মহুয়া রায়চৌধুরীর মধ্যেও পোটেনশিয়ালিটি দারুণ। বাট নট এক্সপ্লয়েটেড। একটু ধরে কাজ করালে দুর্ধর্ষ অভিনয় করেন মহুয়া।'

'আপনার আগের কালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কাদের ভালো লাগে?'

'আগের কালের কোনো অভিনেত্রীকেই ভালো লাগে না। অভিনেতাদের মধ্যে শুধু ছবি বিশ্বাস। ছবিবাবুর কথা ভাবলেই মানিকদার 'জলসাঘর' ছবির বিশ্বম্ভর রায়কে মনে পড়ে যায়। ছবিবাবুকে পর্দায় দেখলেই মনে হয়, যেন উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে এসেছেন একজন মানুষ। টোটাল স্ক্রিন পার্সোনালিটি তাঁর ছিল। ছবি বিশ্বাসের ইয়ং এজ-এর কোনো ছবি দেখার সুযোগ পাইনি। বেশি বয়সের ক্যারেক্টর রোল দেখেই আমি মুগ্ধ। অভিনয়ের সময় কতটা ফুটেজ খাবো, কতটুকু বাদে ডায়লগ বলব, কোন কথার ওপর ওভারল্যাপ করব, এসব বলে বা লিখে বোঝানো যায় না। ইট ইজ এ ডিরেক্ট পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স। সেটা থেকে বুঝতে পেরেছি, ছবিবাবুর ওই সেন্সগুলো কী অসাধারণ ছিল!'

'রোমান্টিক হিরো থেকে শুরু করে নানা ধরনের চরিত্রে আপনাকে দেখা গেছে। কোনো বিশেষ টাইপে আটকে পড়েননি। এই ব্যাপারটা হলো কিভাবে? আপনিই সতর্ক ছিলেন? নাকি পরিচালকরা আপনাকে এই সুযোগ দিয়েছেন?'

'রোমান্টিক নায়ক না হয়েও কোনো চরিত্রে যদি ভালো অভিনয় করা যায়, একটু ভেবে-চিন্তে, চরিত্রটাকে বুঝে, দর্শকদের ভালো লাগতে বাধা। নানা রকম চরিত্রে কাজ করার আলাদা মজাও আছে। আমি পরিচালকদের সেদিকে নজর করালাম। ভ্যারাইটি রোল চাইলাম। তাছাড়া গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলাম...... আমি আসলে সুটেবল নই বাংলা ছবির তথাকথিত রোমান্টিক চরিত্রের পক্ষে। একেক জনের মানসিক গঠন একেক রকম। গাছের ডাল ধরে নাচ-গান বোকা বোকা লাগে। আমার রোমান্টিক সেন্স যা, তেমন ছবি টালিগঞ্জে বড় একটা হয় না। যেমন, বিমল করের উপন্যাস থেকে 'অসময়' – খুব ভালো অ্যাটেম্পট করেছিলেন ইন্দর সেন। এক পূর্ণবয়স্কা মহিলার জীবন সংকটকে ঘিরে জীবনের গভীরতর অর্থ অন্বেষণ। সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক মুক্ত মনের প্রবল দ্বন্দ্বের কাহিনী।'

'বাংলায় আপনার প্রিয় প্রেমের ছবিগুলোর নাম জানতে ইচ্ছে করছে।'

'সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প নিয়ে তপন সিংহর ছবি 'জতুগৃহ'। এ সেপারেটেড কাপল্ মিট এগেন অ্যাট এ রেলওয়ে স্টেশন। একেই বলে রোমান্টিক ছবি। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' যেমন। এ প্যান অব্ প্যাথজ আছে, একটা ম্যাচিওরড গপ্পো, ম্যাচিওরড রোম্যান্স। পেছন পেছন ঘোরা নয়। অকারণে দৌড়ানো নয়। নাচ-গান নয়। ওই গান-টান এলেই পুটস মি অফ। রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে মানিকদাও দুটো অসাধারণ প্রেমের ছবি করেছেন। 'চারুলতা' এবং 'অপুর সংসার'। সকালবেলায় বিছানার ওপর অপুর স্ত্রী অপর্ণার একটা মাথার কাটা পড়ে রয়েছে। বা অপুর সিগারেটের প্যাকেটে দিনে দুটোর বেশি সিগারেট না খাবার লিখিত হুকুম। এর থেকে বেশি আর কি রয়েছে রোম্যান্স-এর? কত অল্প কথায়, অল্প স্প্যানে কত কী বলা হয়ে গেল! এবং কী ব্যাঞ্জনাময়!'

'আজ পর্যন্ত আপনার অভিনীত সেরা চরিত্র কোনটা?'

'সেরা কিনা জানিনা, কাজ করে ভালো লেগেছে, এমন তিনটে ছবির কথা বলি। শংকরের কাহিনী অবলম্বনে তপন সিংহর 'এক যে ছিল দেশ' ছবিতে অ্যামেরিকা ফেরত আধপাগলা, অ্যাবসেন্ড মাইনড-এর সায়াণ্টিস্ট অবনীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র। অভিনয়ের ভীষণ স্কোপ ছিল। সতর্ক ছিলাম, কোথাও যেন মনে না হয়, কনসাসলি বা এফোর্ট দিয়ে ধরবার চেষ্টা করছি চরিত্রটা। আই হ্যাড টু অ্যাবসেন্ড মাইন্ডেড! মনোজ মিত্রের নাটক 'সাজানো বাগান' থেকে তপনদারই 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে আমার মূলত ডাবল রোল। জমিদার ছ-কড়ি এবং তাঁর ছেলে ন-কড়ি। ছ-কড়ির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মারা গিয়ে পরে আবার ভূত হয়ে এলেন। ন-কড়ির বয়স প্রথমে বাইশ, পরে পঞ্চাশ –বিভিন্ন বয়সের অভিনয় করতে হলো। খেয়াল রাখলাম, একটা চরিত্র যেন আরেকটার সঙ্গে ওভারল্যাপ না করে যায়। বা বিভিন্ন এজ-এর মধ্যে। ডিস্টিংশন যেন আনা যায়। অপর্ণা সেনের 'পরমা' ছবিতে আমি হলাম পরমার স্বামী ভাস্কর চৌধুরী। বনেদী, কনজারভেটিভ পরিবারের ছেলে, মার্কেন্টাইল ফার্ম-এর ডিরেকটর। টিপিক্যাল মেল সভিনিস্ট একজন মানুষ। বাড়িতে যেমন একটা আলমারি আছে, একটা বউও আছে। হঠাৎ যেদিন ভাস্কর জানতে পারলেন, তাঁর ভাইপোর বন্ধু রাহুলের সঙ্গে পরমার একটা অ্যাফেয়ার ডেভলপ করেছে – মেণ্টাল লেভেলে, ফিজিক্যাল লেভেলে, সেদিন এই ধাক্কার চোটে মানুষটা ভেঙে পড়লেন। ভয়ানক দ্বন্দ্ব এলো তাঁর জীবনে। অসম্ভব ম্যাচিওরড ছবি। অপর্ণারই লেখা প্রেম এবং প্রেমহীনতার গপ্পো।'

'অন্য ধরনের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি দাঁড়িয়ে। টালিগঞ্জের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ান কেমন করে?'

হো হো করে হেসে উঠলেন দীপংকর: 'খাওয়াই না! মাঝে-মধ্যে আবার পেটের দায়ে হ্যা-হ্যা করে যাই!' □

সুজয় সোম

মীনাক্ষী শেষাদ্রি ঃ সর্বোচ্চ স্থান দখলই একমাত্র সাধনা

মীনাক্ষী শেষাদ্রি রূপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন মাত্র দু বছর আগে। অথচ এর মধ্যেই তিনি যথেষ্ট আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মনোজকুমারের ভাই রাজীব গোস্বামীর বিপরীতে তাঁর প্রথম ছবি 'পেইন্টার বাবু' বক্স অফিসের সাফল্য পায়নি। মীনাক্ষী এই ধাক্কা খুব সহজেই কাটিয়ে ওঠেন যখন তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'হিরো' রজত জয়ন্তীর সাফল্য অর্জন করে।

সৌভাগ্যক্রমে 'পেইন্টার বাবু' রিলিজ হওয়ার আগেই মীনাক্ষী সুভাষ ঘাইয়ের 'হিরো'-র জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তা না হলে প্রথম ছবি ফ্লপ করা হিরোইনের পক্ষে ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে নেওয়া মুশকিল হত। এখন আর মীনাক্ষীর পিছনে তাকাবার প্রয়োজন নেই। এখন শুধুই এগিয়ে চলা, যতদিন না পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্থানটি দখল করা যায়। কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই মীনাক্ষী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান।

ব্যস্ততম নায়িকার সাক্ষাৎকার পাওয়া যে কী ঝামেলা তা আমি খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছি। মীনাক্ষী আজ বম্বের কাছে কোনো শহরতলিতে শুটিং করছেন তো কাল মোম্বাসা উড়ে যাচ্ছেন। পরের দিন হয়তো কাঠমান্ডু বা মাদ্রাজে তাঁর শুটিং চলছে। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকেন তখনও তাঁকে পাওয়ার উপায় নেই, কেউ না কেউ উপস্থিত থাকেন। অবশেষে অনেক চেষ্টা করে তাঁর দেখা পেলাম। দেব আনন্দের নতুন ছবি 'ম্যায় তেরে লিয়ে'-র জন্য মীনাক্ষী কয়েকদিন বম্বেতে ছিলেন। আমি এই ফাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। 'ম্যায় তেরে লিয়ে'-তে মীনাক্ষীর বিপরীতে নায়ক দেব-পুত্র সুনীল আনন্দ। সম্প্রতি শেখর কাপুরের নির্দেশনায় 'জোশিলে'-র কাজ শেষ করলেন লাদাকে। এবার যাবেন কাঠমান্ডু – পেহলাজ নিহালনির 'আঁধি তুফান'-এর শুটিং করতে। এই বইতে তাঁর বিপরীতে আছেন শত্রুঘ্ন সিনহা এবং মিঠুন চক্রবর্তী।



মেহবুব স্টুডিওতে দেবানন্দের ছবির শুটিং সবেমাত্র সেদিনকার মতো শেষ হয়েছে। মীনাক্ষী নিজের সাজঘরে গিয়ে বসতেই আমি হাজির হলাম। "ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই এখন আমাকে চাইছে – এটা ভাবতেই ভীষণ ভাল লাগে"–এই ছিল মীনাক্ষীর প্রথম কথা। তাঁর ব্যস্ত রুটিনে তখনো অনেক কাজ বাকি। এখান থেকে যেতে হবে 'সী রক হোটেল'-এ, যেখানে সমু মুখার্জির 'লাভার বয়'-এর শুটিং চলছে। মীনাক্ষীর বিপরীতে আছেন রাজীব কাপুর। সেখানেই শেষ নয়। এরপর জুহুর 'সান এন্ড স্যান্ড' হোটেলে পার্টি। দেব আনন্দের নতুন ছবি উপলক্ষে এই পার্টিতে নায়িকা হিসেবে তাঁর উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

তাঁর এই ব্যস্ততা দেখে প্রশ্ন করলাম, "সারা দিনরাত ধরে একসঙ্গে প্রায় দুই ডজন ছবিতে কাজ করে ক্লান্ত হন না? এটা তো আপনার শরীরের পক্ষেও ক্ষতিকর, তাছাড়া নিজেকে বেশি সহজলভ্য করে ফেললে পরে অসুবিধা হবে না? খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "নিজেকে খুব বেশি সহজলভ্য করে তোলা ঠিক না, এটা আমি বুঝি। কিন্তু একজন উঠতি অভিনেত্রীর কি কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত? বিশেষ করে প্রযোজকরা যখন ভাল ভাল প্রস্তাব নিয়ে আসেন। তাই বলে দুই ডজন ছবি মোটেও করছি না। এখন আমার হাতে আছে প্রায় বারোটা ছবি, তার মধ্যে ছ'সাতটার কাজ চলছে।"

মীনাক্ষীর প্রধান সহকারী হাসমুখ সেই 'পেইন্টার বাবু'-র প্রথম দিন থেকেই মীনাক্ষীর সঙ্গী। আমাদের কথার মাঝখানে হাসমুখ বললেন 'মীনাক্ষী হয়ত সুভাষ ঘাইয়ের নিজের বইতেও অভিনয় করতে পারবে না। এর প্রথম কারণ হল

মীনাক্ষী শেষাদ্রি



সুভাষ ঘাইয়ের নির্দেশনায় (নারি সিপপি প্রযোজিত) 'মেরি জাঙগ'-এ মীনাক্ষী এখন কাজ করছে। আর দ্বিতীয়ত মীনাক্ষী সামনের বছর পর্যন্ত ব্যস্ত, কোনো 'ডেট' নেই অথচ সুভাষ এখনই কাজ করাতে চাইছেন'।

"কোনোছবির কনট্রাক্টই আমি অন্ধের মতো সই করি না। আগে ভাল করে জেনে নিই আমার রোলটা কেমন। আমি জানি ইন্ডাস্ট্রি পুরুষ-অধ্যুষিত এবং বেশিরভাগ ছবিই নায়ক প্রধান, তবুও এই ধরনের ছবি 'মেরা জবাব'-এ আমার চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নায়িকা প্রধান ছবিতে অভিনয় করতে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি। যেমন জয়া প্রদা করেছিলেন 'সরগম'-এ। ওই ছবিতে নাচের নৈপুণ্য দেখানোরও প্রচুর সুযোগ ছিল। তবে এখানে টিকে থাকতে হলে ওসব বেশি ভাবলে চলবে না। জনগণের রায়ে বক্স অফিসের আনুকূল্যে যাদের অভিনেত্রী হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে তাদের প্রতিষ্ঠা পেতে হলে 'বাজার চলতি' রোল করতেই হবে।"

একটা ব্যাপারে অবশ্য মীনাক্ষী খুব কড়া। শরীর-দেখানো কোনো দৃশ্যে তিনি কখনো অভিনয় করেন না। তাঁর নিজের কথায়, "হিরো'-তে অবশ্য আমার একটা স্নানের দৃশ্য ছিল কিন্তু সেটা ছবির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই এসেছিল। শুধুমাত্র দর্শকদের সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য যদি কোনো নির্দেশক বা প্রযোজক আমাকে ওই ধরনের প্রস্তাব দেন তাহলে আমি কখনোই রাজি হব না, তা সে যত বড় কাজই হোক। আমারও আদর্শ আছে।"

ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই জানেন মীনাক্ষী খুবই ঠান্ডা মাথার মেয়ে, আর খুব হিসেবী। তবে একটা বদনাম তাঁর আছে – তিনি সব সময়ই নাগালের বাইরে থাকতে পছন্দ করেন। সাংবাদিক বা প্রযোজক কেউ-ই তাঁকে মিশুকে বলে জানেন না।

বেশ বিরক্তির সঙ্গে মীনাক্ষী বলে উঠলেন, "কেউ যদি আমার সম্বন্ধে এই ধারণা করে থাকেন তাহলে আমার কিছু করার নেই। এমনিতে আমি একটু অন্তর্মুখী, খুব সহজে কারুর সঙ্গে মিশতে পারিনা। শুটিং-য়ের অবসরে সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে গল্প বা হাসি-ঠাট্টা আমি কখনো করতাম না। তার বদলে নিজের পড়াশুনা সারতাম। হয়ত জানেন এ বছর আমি বি এ পাশ করলাম। সময়ের অভাবে আমি বেশি পড়াশুনা করতে পারতাম না তাই একটু সময় পেলেই বই খুলে বসতাম। আমার তো ভীষণ চিন্তা ছিল পরীক্ষা নিয়ে। যাই হোক শেষপর্যন্ত আমি ভালভাবেই পাশ করেছি।"

পরীক্ষার চিন্তাটা চলে যাওয়াতে মীনাক্ষী এখন অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে কেউ বিরক্ত হচ্ছেন না। তবে একটা কথা মনে রাখা ভাল – মীনাক্ষী একটু গম্ভীর চরিত্রের অভিনেত্রী যিনি 'সেট'-এর মধ্যে ঘোরাঘুরি, গল্প-গুজব পছন্দ করেন না। পড়াশুনাকে মীনাক্ষী যথেষ্ট গুরুত্ব দেন এবং উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছাও তাঁর আছে। গোঁড়া আয়ার পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়ে মীনাক্ষী শিক্ষাকে আরাধনাই ভাবতে শিখেছেন। বাবা উচ্চশিক্ষিত, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, মা বিখ্যাত গায়িকা এবং এক সময়ে নাম করা নৃত্যশিল্পী ছিলেন। নাচ-গানের প্রতি মীনাক্ষীর ঝোঁক খুব ছোটবেলা থেকেই, এ ব্যাপারে মাই তাঁকে উৎসাহ দেন। নাচে শিক্ষালাভ আজ তাকে অনেক সাহায্য করছে।

মীনাক্ষীর ফিল্মে আসার কাহিনী জানতে স্বভাবতই ইচ্ছা করছিল। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "পেইন্টার বাবু-র রোলটা কীভাবে পেলেন? মনোজকুমারের সঙ্গে কোথায় প্রথম দেখা হয়?" "বলতে পারেন ভাগ্যই আমার আর মনোজকুমারের সাক্ষাৎ ঘটায়। অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছা আমার কোনো দিন ছিলনা। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল নাচ নিয়ে অনেক দূর পড়াশুনা করার। নিজের ভাব প্রকাশের এক সুন্দর মাধ্যম হল নাচ, যা আমাকে খুব অল্প বয়স থেকেই আকৃষ্ট করেছে। হঠাৎ খেয়াল বশেই 'ইভস উইকলি'-র মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে বসলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে বিজয়িনী হলাম। অমনি ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রচুর প্রস্তাব আসতে লাগল। এরকম অনেক প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি কিন্তু মনোজকুমার যখন বললেন তখন আর না করতে পারলাম না। কী হতে চলেছে সেটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই সুভাষজী আমাকে 'হিরো'-র জন্য সই করিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। 'পেইন্টার বাবু' ফ্লপ করলেও দর্শক আমাকে গ্রহণ করেছেন কারণ ততদিনে 'হিরো' রিলিজ হয়ে গেছে। আর যেই 'হিরো' হিট করল অমনি চতুর্দিক থেকে আমি অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে আরম্ভ করলাম। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি এটা আমার সৌভাগ্য।"

এই মুহূর্তে বম্বের প্রথম সারির সব নায়কের সঙ্গেই অভিনয় করছেন মীনাক্ষী। জ্যাকি শ্রুফ তাঁর বিপরীতে আছেন 'প্যায়সা এ প্যায়সা' আর 'মেরি জবাব'-এ, অনিল কাপুর আছেন 'মেরি জাঙগ'-এ। দেবর ফিল্মসের 'বেবফাই'-তে মীনাক্ষীর নায়ক রাজেশ খান্না, 'হোশিয়ার'-এ জিতেন্দ্র। এছাড়া সানি দেওল এবং জিতেন্দ্রর সঙ্গে আরো দুটো ছবির কথাবার্তা চলছে। হাসমুখের কথায়, 'আমি সব সময় খেয়াল রাখি যাতে মীনাক্ষী হয় ভাল রোল পায় নয়ত ভাল পারিশ্রমিক পায়। বাজে ছবিতে কম পারিশ্রমিকে ও কেন কাজ করবে?'

মীনাক্ষী নিজেকে কোনো এক ধরনের অভিনেত্রী করে তুলতে চান না। "সৌভাগ্যক্রমে 'পেইন্টার বাবু' আর 'হিরো'-তে আমার চরিত্র দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এক ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে আমি খুব অপছন্দ করি। আমার কাছে প্রযোজকরা বিচিত্র সব চরিত্র নিয়েই আসেন। একটা কথা আমি তাদের ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে, ছবিতে গুরুত্ব নেই এমন কোনো তুচ্ছ চরিত্রে আমি অভিনয় করব না। বর্তমানে আমি যে কটা ছবিতে কাজ করছি তার কোনোটাতেই আমার 'পুতুলের' ভূমিকা নেই।

"আমি অভিনেত্রী হতে চাই, তারকা নয়। তারকারা দু' বছরের বেশি স্থায়ী হন না। আমি চাই না শুধু দু বছরেই আমার চলচ্চিত্র জীবনের অবসান হোক। অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বহু বছর লোকে তাকে মনে রাখে। আমার অভিনেত্রী হওয়ার সব কৃতিত্বটাই আমার নাচের শিক্ষকদের। ভরত নাট্যমের প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁরা যেভাবে শিখিয়েছেন তা আজ আমাকে বিশেষ সাহায্য করছে ক্যামেরার সামনে নানারকম অভিব্যক্তি আর অভিনয় তুলে ধরতে। নাচ জানলে অভিনয়ের অর্ধেক কাজ জানা হয়ে যায়।

"ওপরে ওঠবার জন্য আমার সেরকম কিছু তাড়া নেই। আমি সর্বোচ্চ আসনটা পেতে চাইব ঠিকই তবে সময় এবং সুযোগ মতন, হুড়োহুড়ি করে নয়। এই ব্যাপারে শ্রীদেবী বা জয়া প্রদার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। যে রোল শ্রীদেবী বা জয়া প্রদার জন্য ঠিক করা হয়েছে তা আমি কখনোই পেতে পারি না। অভিনেত্রীরা কেন যে একে অপরকে সহ্য করতে পারে না, বুঝি না। দুজন অভিনেত্রী কি কখনো বন্ধু হতে পারে না? আমার তো মনে হয় একজন আরেকজনের জায়গা কখনো দখল করতে পারে না। অবশ্য সুস্থ প্রতিযোগিতা আমি ভালবাসি।"

জ্যোতি ভেঙ্কটেশ

খোশ খবর

হৈ হৈ করে বম্বেতে বিয়ের মরশুম শুরু হয়ে গেছে। পরিচালক প্রকাশ ঝা ও অভিনেত্রী দীপ্তি নাভাল-এর বিয়ে দিয়েই এই মরশুমের শুভ সূচনা। 'হিপ হিপ হুররে' ছবিতে দীপ্তি ছিলেন অভিনেত্রী আর সেই ছবির পরিচালক হলেন প্রকাশ ঝা। ছবিটি যতদিন মুক্তি পায়নি এবং সমালোচকরা ছবিটিকে যতদিন না

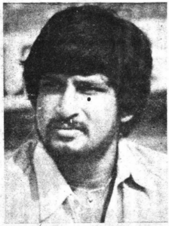


দীপ্তি নাভাল

প্রশংসা করেছেন ততদিন পর্যন্ত এই যুগল তাঁদের অনুভব আর আবেগের প্রকাশ বাইরে দেখাননি, যদিও তাঁরা বলছেন যে এ ছিল প্রথম দর্শনেই প্রেম। আমাদের এক দুর্মুখ বন্ধু বললেন, আসলে দীপ্তি চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন — যে মানুষটিকে তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন তিনি যেন ফালতু না হন।

* * * *

ক্রিকেট খেলোয়াড় ও ছায়াছবির তারকা সন্দীপ পাতিল খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে বিয়ে করে বসেছেন স্থানীয় কলেজের ছাত্রী দীপা দিভেকারকে। জানা গেল দীপা ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। তবে তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে জানবার চেষ্টা করছেন খেলাটিকে।



সন্দীপ পাতিল

যেহেতু ফিল্ম জীবনে সন্দীপের সাফল্য তেমন এল না সেহেতু দীপার ছায়াছবি সম্পর্কিত জ্ঞানের চেয়ে ক্রিকেট প্রসঙ্গে পড়াশোনাই বেশি জরুরী। সন্দীপের বিয়ের জ্ঞানগম্যি বেশ ভালোই কারণ ইতিমধ্যেই তিনি একটি বিয়ে করেছিলেন এবং দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে ভালোবাসায় বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অন্তরঙ্গরা অবশ্য বলেন যে সন্দীপকে অন্যায়ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। সন্দীপের 'কভী আজনবী থে' কবে যে মুক্তি পাবে কে জানে এবং ছবিটি মুক্তি পেলেও তাতে সন্দীপের যে খুব ভালোরকমের লাভ হবে তাও মনে হয় না। মনে হয় ক্রিকেটে ফিরে যাওয়াই ভালো — এবং বুদ্ধিমান সন্দীপ তাই করেছেন।

* * * *

বিনোদ মেহেরার কথা উঠলে অবশ্যম্ভাবী রেখার কথা এসে পড়ে। যদিও রেখা বহু প্রশংসিত এক উজ্জ্বল অভিনেত্রী তবুও তিনি মাঝেমাঝেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে থাকেন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তাঁর দুই বোন ধনলক্ষ্মী ও রাধাকে তিনি এই 'অত্যন্ত বাজে' ফিল্ম লাইন থেকে দূরে রাখতে চান। অবশ্য দুই বোনই মনে করেন যে, রেখা সম্ভবত নিজের পরিবারের লোকদের তাঁর প্রতিযোগী করতে চান না বলেই এই সমস্ত গাওনা গান। রেখা তাঁর সৎবোন (জেমিনি গণেশনের দ্বিতীয়া পত্নীর কন্যা) জিজিকে এই প্রবঞ্চনাময় শিল্পের ভয়াবহ খারাপ দিকগুলি বোঝাতে গিয়ে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। জিজি ফিল্মে অভিনয় করার ব্যাপারে কৃতসংকল্প এবং প্রযোজকেরাও তাঁকে ছবিতে নেওয়ার ব্যাপারে দারুণ আগ্রহী। দেখা যাক, রেখা এখন কী করেন!

* * * *

পরভিন বাবীর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ এবং ফ্যানেরা হয়তো আর তাঁর সম্বন্ধে তেমন উদ্বিগ্ন নন, কিন্তু উঠতি সংগ্রামী অভিনেতা দলীপ তাহিল পরভিনকে খুঁজে বার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। পরভিনের মা জুনাগড়ের প্রাসাদে ফিরে ফিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন অপেক্ষায়; কবীর বেদী ব্যস্ত কী করে হলিউডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর মহেশ ভাট নিজের ব্যক্তিজীবনের প্রেমকাহিনীকে কীভাবে মূর্ত করে তুলবেন ফিল্মে ('অর্থ') সেই চেষ্টায় রত। এই অবস্থায় পরভিনকে খুঁজে পাওয়ার



পরভিন বাবি

সম্ভাবনা দূর থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। প্রায় এক বছর হলো অভিনেত্রী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন এবং এমনকি তাঁর গুরুজী কৃষ্ণমূর্তিও কিছু খোঁজ রাখেন না। শুধু দলীপ তাহিল খুঁজছেন আর খুঁজছেন আর প্রত্যাশায় রয়েছেন যে ভাগ্য নিশ্চিত একদিন সুপ্রসন্ন হবে। পরভিনের যে সমস্ত প্রযোজকেরা একদিন তাঁকে ভাঙিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করেছেন, এখন তাঁদের কেউ কেউ এসে সাহায্য করবেন কায়েমী স্বার্থশূন্য দলীপকে;এ আশা নিশ্চয় অন্যায় নয়!

* * * *

মনমোহন দেশাই-এর ছেলে কেতন ও শাম্মী কাপুরের মেয়ে কাঞ্চনের বিয়েটি মনে হচ্ছে তেমন সুখের হয়নি। জামাই কেতন কাপুরকন্যার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পর এখন কাপুরদের চড়ামেজাজের তোয়াক্কাও করছেন না। মেয়ে ভোলানোর লীলাখেলা কেতন বেশ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। কিম যদিও নোংরা গল্প বাজারে ছাড়তে রাজি নন, সোমা আনন্দ কিন্তু সে ভয়ে ভীত নন। এই সেদিন সোমার বাবা-মাকে চোখ রাঙিয়ে যখন কেতন সোমার শয়নকক্ষে এসে পৌঁছুলেন তখন আগ্রহী প্রণয়প্রার্থীকে আনন্দ ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে সোমার যে সাহস আছে শাম্মী কাপুরের তা নেই।



'কমলা' ছবির একটি দৃশ্য

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউজ পেপার গোষ্ঠী একটি মামলা দায়ের করেছেন প্রযোজক-পরিচালক ডঃ জগমোহন মুন্দ্রার 'কমলা' ছবির বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য হলো – ছবিটি এই পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রতিবেদক অশ্বিনী সারিন ও মালিক রামনাথ গোয়েঙ্কার সম্মানহানি ঘটিয়েছে। তাছাড়া ছবিটির কপিরাইটও তাঁদেরই। তাঁরা কোনো নগদ ক্ষতিপূরণ চাইছেন না, চাইছেন ছবিটির নেগেটিভ নষ্ট করে দেওয়া হোক। মজার ব্যাপার হলো গোয়েঙ্কা প্রায় কোনো মামলাতেই হারেন না। এটাতেও হয়তো জিতবেন। কিন্তু তাঁরা কি করছিলেন যখন মারাঠি, হিন্দি, ইংরেজি এবং গুজরাটিতে 'কমলা' নাটকটি দিনের পর দিন অভিনীত হয়েছে ?

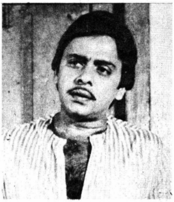
* * * *

তিন নম্বর বিয়ে হল অনিল কাপুরের সঙ্গে সুনীতার। এই বিয়েতে সবচেয়ে কে বেশি মুষড়ে পড়েছেন, জানেন ? – তিনি বিজয়েতা পণ্ডিত। বিজয়েতা একের পর এক ব্যর্থ প্রেমের প্রেমিকা হিসাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। সে যাই হোক – বিজয়েতা অবশ্য দাবি করেছেন – অনিল কাপুর একজন বেশ ভালো বন্ধু। বান্টি মানে কুমার গৌরব হলেন বিজয়েতার সেই প্রেম যেখানে তিনি হেরে গেছেন। সত্যি কি তিনি হেরেছেন ? বান্টি তাঁর পিতা রাজেন্দ্রকুমারের উপর খুবই বিরক্ত হয়েছেন এবং সম্প্রতি বাবার সঙ্গে বেশ বড়সড়ো রকমের ঝগড়াও হয়েছে। বান্টি তাঁর অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে বলেছেন – 'বাবার হস্তক্ষেপে আমার ফিল্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবন দুই-ই নষ্ট হোল। একটিমাত্র ব্যাপার যেটা সম্পর্কে বাবা চিন্তা করতে পারেন সেটা হলো টাকা আর টাকা।' মনে হচ্ছে বিজয়েতা হয়তো বান্টির জীবনে ফিরে আসতেও পারেন।



অনিল কাপুর

সফল সুখী বিয়ে সম্ভবত বিনোদ মেহেরার কপালে নেই। তৃতীয় বিয়েও দুর্ভাগ্যজনক প্রমাণিত হলো। প্রথম বিয়ে রেখার সঙ্গে। দ্বিতীয়বার বেশ ধূমধামের সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে মীনা ব্রোকার সঙ্গে। তৃতীয় বধূ বিন্দিয়া গোস্বামী। সেই বিন্দিয়াও 'ভদ্রলোক' বিনোদকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন উঠতি সহকারী পরিচালক জে পি দত্তের কাছে। বিনোদের কী নেই ! সুন্দর চেহারা, সাফল্য, অর্থ, খানদান, অমায়িক আচরণ সবই তাঁর করায়ত্ত। হায় ! এর কিছুই বিন্দিয়াকে মুগ্ধ করতে পারল না। খোলাখুলিভাবে বিন্দিয়ার মা ও বোন পার্ল বিনোদের হয়ে ওকালতি করছেন। কিন্তু সুন্দরী বিন্দিয়া চমৎকারভাবে ফ্ল্যাট সাজাচ্ছেন জে পি দত্তের জন্যে। তাহলে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় জে পি দত্তের মধ্যে কী এমন জিনিস আছে যা বিনোদ মেহেরার নেই !



বিনোদ মেহেরা

* * * *

দাদা কোন্দকে মারাঠি ছবি করে যেমন সাফল্য পেয়েছিলেন তেমনটি কিন্তু তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি 'তেরে মেরে বীচ মে' করে পাননি। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। দাদা ঘোষণা করেছেন তাঁর দ্বিতীয় হিন্দি ছবির নাম – 'অন্ধেরী রাত মে দিয়া তেরে হাত মে'। ছবিটির নামের মধ্যেই নিহিত আছে দাদার ইচ্ছের কথা। হয়তো হারানো সম্মান ফিরে পাওয়া যাবে ছবিটি করে।

দাদা কি তাঁর প্রিয় অভিনেত্রী উষা চবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেছেন ? এই প্রসঙ্গে দুজনে কোনো কথাই বলছেন না, কিন্তু দুজনকে একসঙ্গে সমস্ত সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।



দাদা কোন্দকে

[শ্বেতকরবী ঃ ২৮ পৃষ্ঠার পর]

ভুলে থাকেন। বাড়ির সামনের দিকটা এখনো কিছু আয় দেয় বাবাকে। ভেতরে একটা বাস কোম্পানির অফিস, একটা ঘরে চানাচুরের কারখানা। বাড়ির যেটুকু আয় আগে সবটুকুই আসত এ বাড়িতে, এখন তার সবটুকু ব্যয় করেন ফুলের জন্য অকাতরে। অথচ নিজের আভিজাত্য-টুকু এখনো ভুলতে পারলেন না। কিংবা আভিজাত্যের অহঙ্কারটুকু ভোলবার জন্যেই হয়ত ফুলের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান।

মা মারা যাওয়ার পর বাবা আর কালমুহূর্ত কলকাতার বাড়িতে থাকেননি। ঠিক তেরদিনের দিন বাবা বেনারসের টিকিট কিনে এনে বলেছিলেন, আর কি, শেষ জীবনটা কাশীতেই কাটিয়ে দেব। ভাড়া যা পাব তা দেব না তোদের। শহরে থাকলে আমি মার খাব। তোরা বড় হয়েছিস, মানুষ হয়েছিস, আমি এখন তোদের কাছেই হাত পাতব। --বাবা চলে গেলেন তা সে চার বছর হয়ে গেল।

মা-মরা ওই লালিটা তখন কত আর? আদর দিয়ে সেবা দিয়ে সংসারের সবরকম দায়িত্ব সেই থেকে পালন করে আসছে অদিতি। লালিকে এইভাবে তাই অন্ধকারে শুয়ে থাকতে দেখে বিছানার ওপর প্রথমে ঝুঁকে পড়ল অদিতি। মাথায় হাত রাখল। তারপর আলো জ্বালতেই দেখল লালি কাঁদছে।

মা মারা যেতে লালি কেঁদেছিল। বাবা বেনারসে চলে গেলে লালি কেঁদেছিল। কাঁদত মাঝে মাঝে মাকে মনে পড়ত বলে। বাবার কথা মনে হলে। আচরণে কোন আঘাত পেলে। কিন্তু আজ কাঁদছে মুখ লুকিয়ে। অন্ধকারে। অদিতি পরম যত্নে হাত বোলাল মাথায়। কপালে, চুলে।

লালির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অদিতি বাবার কথা ভাবল। তারপর বলল, লালি কী কষ্ট হচ্ছে?

নিঃশ্বাস নিতে আবার তেমনি কষ্ট হচ্ছে।

বছর দুই আগে এই অসুখটা এসেছে লালির। প্রথমে একদিন প্রচণ্ড ব্যথা, ডাক্তার এল। তার পরামর্শমত কার্ডিওগ্রাম হলো। ডাক্তার বলল, শুয়ে থাকতে হবে। একটা ট্যাবলেট লিখে দিয়ে বলেছিলেন, এটা খেয়ে যেতে হবে। খেল কিন্তু একেবারে ভাল আর হলো না। খেলে কমে, কিছুদিন বন্ধ থাকে। কিন্তু ঠিক মাসিকের কাছাকাছি ব্যথাটা বাড়ে। এই ফিরছে, চলছে, ঘুরছে, খাচ্ছে, হঠাৎ শুয়ে পড়ে ছটফটানি। ভাল হলে আবার স্বাভাবিক। গান, কলেজ, সংসারের টুকিটাকি।

সুমন ঘরের ভেতর এসেছিল চা-এর কথা বলতে। ঢুকে বলল, কী হয়েছে?

ব্যথা উঠেছে। কষ্ট হচ্ছে সেই আগের মতন আবার।

ট্যাবলেটটা দে না।

না। ও আর খাব না। লালি আড়ষ্ট গলায় বলল। অনুযোগ করল। কিছু হয় না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি আর সারব না।

সুমন বলল, বামনদি কোথায় রে, দেখলাম না।

দোকানে পাঠিয়েছি। ট্যাবলেট আনতে।

ও। সুমন একটু ইতস্তত করে বলল, কিন্তু একটু যে চা করতে হবে।

কে রে?

সুমন বলল, রুদ্র।

নাকি? বেশ পরে অনেকদিন। অদিতি বলল।

হুঁ। এক সপ্তার জন্য এসেছে কলকাতায়।

কোথায় থাকে যেন?

বোম্বে। ছবি করছে।

অদিতি অবাক হলো না। বলল, ভালই তো।

সুমন বলল, কী মোটা হয়েছে।

হুঁ? প্রশ্নালু তাকাল অদিতি।

হ্যাঁ। একটু থেমে বলল, হবে না?

কেন? অদিতি লালির কপাল থেকে হাত তুলে নিল লালি ঘুমিয়ে পড়েছে বলে।

কেন আবার? অ্যালকোহল। মাল খাচ্ছে খুব। ঠিক ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু বলল, এখনো ড্রিংক করে আছে বলে মনে হলো। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরল, কী গোঁফ বানিয়েছে মাইরি, ফর্মাটা যা বানিয়েছে না?

চুল। জুলপী? অদিতি হাসল।

ওগুলো তো পেটেন্ট এখন। ভেরি কমন।

চার

লালি ঘুমিয়ে পড়েছিল। রুদ্র চলে গেল রাত করে। সুমন এ ঘরে এসে দেখল অদিতি লালির পিঠের কাছে আধশোয়া হয়ে ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ছে একটা সাপ্তাহিকের। সুমন বলল, লালি খাবে না?

জাগিয়ে লাভ নেই। অদিতি পত্রিকা থেকে চোখ তুলে ওকে দেখল। ঘুমোক।

রাত হল অনেক খেতে দে।

সুমন বলল, চট করে আমি একটু বাথরুম সেরে আসি, তুই ততক্ষণ ওঠ।

খেতে বসে বলল, লালি খেল না।

অদিতি রুটি ছিঁড়ে সবে মুখে পুরেছিল। বলল, কদিন আর খায়। কী যে হবে মেয়েটাকে নিয়ে।

আর হবে। সুমন ঢোক গিলে বলল। ইস! এটাতে কি ঝাল হয়েছে রে। সুমন এবার ওর দিকে তাকাল। ডাক্তার বদ্যি তো আর কম হলো না। একটু জল খেল এবার। খেয়ে দাঁতে কি একটা বেধেছিল ফেলে দিয়ে বলল, এখন বরাত।

দুজনেই বেশ একটু চুপ করে থাকল। তারপর সুমনই বলল, গানটা অবিশ্যি ভালই গায়। কাল বাইরে দাঁড়িয়ে একটু শুনলাম। কালই বোধহয়।

চেষ্টা করে খুব। অদিতি বলল।

করে লাভ নেই। হবে না।

কেন?

আমাদের এই সেট আপ-এ কিছু হয় না। কারো কোনদিন হয়নি। হবেও না। সুমন এবারে মুখের মধ্যে গ্রাস নিয়ে চিবোলো। চিবোতে চিবোতে বলল, একটা না একটা অন্তরায় থাকবেই। দেখছিস না, আমিও কি চেষ্টা কম করলাম?

ভাগ্য।

ওই তোদের এক কথা। ভাগ্য। সুমন এবার উত্তেজিত হল, ভাগ্য আবার কি? ওসব আমি মানি না। নেপোলিয়নের হাতে কোনো রেখাই ছিল না। ছুরি দিয়ে চিরে বলেছিলেন, দিস ইজ মাই ফেট লাইন।

অদিতির খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তবু উঠছিল না। রাত হয়েছিল। তবু এই ধরনের গল্প খেতে বসলে ওদের প্রায়ই হয়। সুমন বলল, তাছাড়া পরিবেশটাও তো ধরতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এসকিমোদের ভেতর জন্মালে বড় জোর একটা জাতীয় সঙ্গীত লিখতে পারতেন।

অদিতি বলল, এসব তোর রাগের কথা। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিকম।

সুমন যেন শুধরে নিল। নিয়ে বলল, সেটা অবিশ্যি আমিও মানি। আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নাম যদি চন্দ্রনাথ, আদিনাথ কি

ত্রিনাথ হত, তাহলে তিনি রবীন্দ্রনাথই হতেন। সুমন মাথা হেঁট করে একটু কাল চুপ করে থেকে অদিতির চোখে তাকাল। বলল, শেকসপীয়ার দেখ লাইফ। বিত্ত ছিল না। টলস্টয় যেদিন সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে মানুষদের ভেতর এসে দাঁড়ালেন সেদিন তাঁর পরিচয় সত্য হল। গোর্কী দেখ? শ' দেখ? ওদিকে কীটস, গঁগা, লরেন্স, হ্যামস্যুন, এদের কারো প্রাচুর্য ছিল না। বায়রন দেখ, কী লাইফ। প্রাচুর্যের অভাব ছিল না।

ঠিক।

কিন্তু পরিবেশ, শিক্ষা, সমাজ এসবেরও একটা প্রয়োজন আছে বৈকি। এদের ইনফ্লুয়েন্স সেই?

অদিতি উঠি উঠি করেও বসল। বলল, চেষ্টা নেই, ক্ষমতা নেই এমন তো অনেক আছে। শুধু গালমন্দ করে। অসুস্থ পরিবেশের দোহাই দিয়ে শুধু অনুযোগ করে। এমন দৃষ্টান্তও তো ভূরিভূরি। একটু থতমত খেল সুমন। সেটা আর কে বলছে। কিন্তু কিছু নেই, অথচ শিরোমণি হয়ে বসে আছে, এমন দৃষ্টান্তও তো ভূরিভূরি। সুমন এবার সমর্থনের ভঙ্গিতে অদিতির চোখে তাকাল। এই ধর না রুদ্র।

এতবড় একটা লেকচার শুনে না কি অদিতি হাসল। সুমন উত্তেজনা একটু সামলে নিয়ে নিজেও হেসে ফেলল। ফেলে বলল, না না হাসি নয়। আমি কিছু বেঠিক বলিনি।

অনেক কিন্তু রাত হলো অদিতি বলল। থালাটা একটু সরিয়ে রেখে গ্লাশ বাটি তার ওপর বসাল। তারপর উঠল। সুমন উঠল, সোজা বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢোকার পথে একটু থমকে দাঁড়াল লালির ঘরের সামনে, তারপর নিজের ঘরে এসে সিগারেট ধরাল।

রেডিও প্রোগ্রাম বন্ধ হলো পাশের বাড়ির রেডিওতে। জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে। গলির মুখের ল্যাম্পপোস্টটার আলোটা একবার জ্বলছে আবার নিবছে, ঠিকমত কানেকশান পাচ্ছে না বলে। বালীগঞ্জ স্টেশন পার হয়ে এটুকু আসতে দশ মিনিটের পথ কিন্তু বালীগঞ্জের সঙ্গে জায়গাটার ফারাক অনেক। জানলা দিয়ে তাকালে গাছ, কচুরীপানার পুকুর চোখে পড়ে। ভোরের আগেই ধোপাদের কাপড় পেটানোর শব্দ শুনতে পায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, গলির মোড়ের সেই গাছটা অদ্ভূত একটা ছায়া রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছটাকে কিন্তু আজও চিনতে পারল না। আকাশে তাকাল। পরিষ্কার আকাশ। চাঁদ চোখে পড়ল না। নক্ষত্রের আলোয় তাকিয়ে থেকে এবার বিছানায় এল।

শুয়ে এপাশ ওপাশ করল প্রথমে। তারপর উঠে জল খেল। ঠিক খাওয়া শেষ হলেই শোয় না সুমন, অভ্যাসমত কিছু না কিছু পড়া চাই-ই। কিন্তু লালির জন্য মনটা কেমন খারাপ হয়ে আছে তখন থেকে। তাছাড়া ওই রুদ্র।

রুদ্রকে দেখার পর থেকে সুমন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। অথচ ভদ্রতার খাতিরে চা খাইয়েছে, সিগারেট দিয়েছে, উল্টে আবার তার বুলি গলাধঃকরণ করেছে।

রুদ্র ঘরে ঢোকার পর থেকেই উঠব উঠব করছিল, কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তবে উঠল। ওঠার আগে বলল, দ্যাখ সুমন, আমি নিজেকে একবার নিলামে তুলতে চাই। আমার কদর যাচাই করতে চাই।

বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল রুদ্র এবং একাই প্রায় বকবক করছিল। সুমন বাজে কথায় অত কান দিচ্ছিল না। আবার শুনছিল। সমর্থনের ভঙ্গিতে কখনো ঘাড় দোলাচ্ছিল। নিজের মনে সিগারেট খাচ্ছিল। অস্বস্তি বোধ করছিল।

এই রুদ্রর কথা মনে হলে অদ্ভূত শিহরণ জাগে সুমনের। কেমন একটা পুলক জাগে। তখন স্মৃতির পুরু আবরণ ছিঁড়ে গিয়ে পেছনের সব কাহিনী, সব ঘটনা চোখের ওপর উঠে আসে। সেই স্কুল জীবনের



বন্ধুদের কথা মনে আসে। বিশেষ করে বন্ধু রোল টেন, এই রুদ্র আর হিমানীশ।

শুয়ে শুয়ে সুমন ভাবছিল, ভালবাসার ওপর অতশত জ্ঞান থাকার তখন কথা নয় ওদের। কত আর? গোঁফের রেখা উঠেছে সবে, রুদ্রর অবিশ্যি উঠেই গিয়েছিল। মেয়েদের কথায় কেমন একটা পুলক হত তখন। এই বয়েসে রুদ্র অনেক কিছু জানে বলে কেমন একটা সম্ভ্রম আসত ওর ওপর। স্কুলের শেষ পিরিয়ডে রুদ্র আমাদের নিয়ে স্কুল-পালাতে নেতৃত্ব দিত। একটু পাশে, কয়েকটা বাড়ির পরেই মেয়েদের স্কুল। ওদের ছুটি হওয়ার মুখে এসে রাস্তায় দাঁড়াত। তারপর ওদের ছুটি হলে এক একটা মেয়ে দেখিয়ে বলত, এটা আমার, এটা রোল টেনের, ওই দুটো হিমানীশের। স্কুলের মোটা ঝি-টা এক দঙ্গল মেয়ে চালিয়ে নিয়ে প্রফুল্ল নাটকের জগমণির মত সদম্ভে চলে যেত। ঝি-টার দিকে তাকিয়ে বলত, এইটা হল ক্যাবলাকান্তর। তারপর আমার কানটা বেশ জোরে মলে দিয়ে বলত, তোকে শ্লা মানুষ করতে পারলাম না। দাড়িতে হাত দিয়ে নাড়া দিত। আহা! গুডিগুডি বয়, ভাল ছেলে। ইসকুল কাটতে চাইবি, আবার টেকো স্যারের হোমটাস্ক করে আসবি। শালা গাছেরও খাবি, তলারও কুড়োবি। মাথায় গাঁট্টা মারত এবার। আহা, যা ভোম্বল মার্কা চেহারা? মেয়েটেয়ে তোর বরাতে নেই। যা শালা সিগ্রেট কিনে আন।

পয়সা নেই।

ওমনি ওমনি জ্ঞান দেয় না? ভালবাসার অনেক দাম, ভাল পয়সা লাগে গো আতাকেলানে।

তারপর হঠাৎ ভাল ছেলে সেজে যেত। এই, নীলা আসছে। সবাই রামকেষ্ট হয়ে যা। এই শালা গুড বয় পড়ার কথা বল। রোল টেনের পাশের বাড়ি শালা। জ্যামিতির উপপাদ্য বল।

নীলা চলে গেলে রুদ্র নিজেই উপপাদ্য আওড়াত, লাল ত্রিভুজের সমকোণে বিন্দু। একটা লম্বমান প্রশস্ত সরলরেখায় উহাকে স্পর্শ কর; রেখাটির নাম দাও, সরে আয় বলছি। তারপর নিজেই হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বলত, আমার নিশ্চয়ই কন্যা রাশি শালা, মাথা মগজ যা সাফ, কপালে পরধনপ্রাপ্তি যোগ আছে শালা।

ও বলত, জীবনটা হল নদীর মত। আর ভালবাসা? ভালবাসা সমুদ্রের মত। একটা কেমন পুলক জাগত আমাদের ভেতর। যেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ হত। রুদ্র বলত, ভালবাসার একটাই মন্তর, শিখিয়ে দেব তোদের।

কী মন্ত্র? রুদ্রকে সকলে মিলে গিলে খেতাম। একটু বড়সড় গোছের চেহারা। আমাদের চেয়ে বছর চারেকের বড় হবে হয়ত। আমাদের কান ছাড়িয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা, নীল কুতকুতে চোখ। বদমায়েসীতে টইটম্বুর।

এই রুদ্র স্কুল পালাতে, কেমন করে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরতে হয়, গলার ভেতর ধোঁয়া তুলে দিতে হয়, শিখিয়েছিল। শ্রীকান্ত স্যারের অদ্ভুত মেয়েলি হাসি নকল করতে পারত। ময়ূরের ডাক ডাকত ক্লাশের ভেতর। শাস্তি পেত। অকাতরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে স্যারেরা একটু অন্যমনস্ক হলে ভেংচি কাটত। রুদ্রর গুরুগিরিতে পোক্ত হয়ে গেলে পার্কের ভেতর কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসতাম। রুদ্র গপ্প করত মেয়েদের। বলত, মেয়েদের শালা বিশ্বাস করবি না, পেলেই শালা পেরেক মারবি।

স্কুলের ঘণ্টা থেমে গেলে বলত, এই, জিওগ্রাফির সেই জেগোল স্যার এতক্ষণে আর একবার রোলকল করছে নারে? তারপর বলত, ওই দেখ, দেখ। একজোড়া ছেলেমেয়ে ঘন হয়ে হাসাহাসি করে পার্কের ভেতর ঢুকে গেলে রুদ্র কুকুরের ডাক ডাকত। শালা ভাদ্দর মাসে পেয়েছে আমায়। মরে যাব শালা।

কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর পাখি এসে বসত। ওপর দিকে তাকিয়ে পাখিদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষায় খিস্তি করত। করে বলত, মন্তর শেখাব তোদের ভালবাসার। জীবনকে নতুন করে জানবি, নারী পুরুষের মধুর সম্পর্ক বুঝবি।

সুমন তাকাত।

আহা! ভাল ছেলে আমার গুড বয়।

আবার কখনো কখনো হঠাৎ কেমন সিরিয়াস হয়ে যেত রুদ্র। রুদ্ধনিঃশ্বাস অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ হয়ে বেরিয়ে আসত। গাছে তাকাত। দেখত পাখিগুলো কিচকিচ করছে। ডাকছে। ঝগড়া করছে।

পার্কের ভেতর ওই কৃষ্ণচূড়ার গাছের নিচে থেকে কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরতাম সকলে কোনো কোনো দিন রুদ্রর প্রেমিকার বাড়ি। রুদ্রর ভাষায় দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়ি। মনে পড়ে অসাধারণ রোগা আর ফর্সা পিসিমা একটা খেলনা তৈরির কারখানায় চাকরি করতেন। পিসিমার চিবুকের বাঁদিকে আঁচিল ছিল। ব্যথা হত, বড় হত সময় সময়। ডাক্তাররা নাকি বলত, ক্যান্সার হবে আরো একটু বয়েস হলে।

পিসিমা এ ঘরে বড় একটা আসত না। আসত একটা মেয়ে বড় সুন্দর নরম চেহারা। তখনো শাড়ি ধরেনি। আমাদের চা দিত, চিড়ে ভাজা এগিয়ে দিত।

রুদ্র সুমনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল প্রথম দিন। আলাপ কর। আমার ইন্দুমতি।

এনু লজ্জা পেত। চোখ তুলে তাকাতে পারত না। সুমনও। অনেকক্ষণ পরে টানাটানা কাজলটানা চোখে এনু চোখ তুলে তাকাত। সুমন বিব্রত হত।

অবস্থাটা হাল্কা করতে রুদ্র বলত, ও আমাদের সঙ্গেই পরীক্ষা দেবে। একই সঙ্গে কলেজে পড়ব।

সুন্দর চোখ তুলে আমাদের চোখে তাকাত এনু। তুমিও বুঝি একই ইয়ারে?

জবাব দিত রুদ্র। তারপর সুমনের দিকে তাকিয়ে এনু বলত, তোমার লজ্জা ভীষণ।

কেন?

তুমি খাচ্ছ না যে?

রুদ্র হাসত, ভীষণ লজ্জা ওর। এনু ভেতরে চলে গেলে রুদ্র কান ধরে ওর মাথাটা নিজের ঠোঁটের অনেক কাছে এনে বলত, এমন মন্তর শিখিয়ে দেব না তোকে?

পরীক্ষা দিয়ে সবাই তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। খায় দায়, অফুরন্ত সময়। অথচ কেমন যেন খরচ হয়ে যায়। কে যেন চুরি করে দিনটাকে। দিনটা তখন কত ছোট বলে মনে হয় সকলের। অথচ একটা নতুন জীবনের প্রতীক্ষা যেন। জীবনের কণ্টকময় পথের ধারে দাঁড়িয়ে শুধু ইঙ্গিতের অপেক্ষায় অপেক্ষা করা মাত্র।

রেজাল্ট বেরুনোর মুখে রোল টেন একদিন বলল, চল ঘুরে আসি।

কোথায়?

তার প্রেমিকার বাড়ি। তোকে ডেকেছে। মহিম তোকে বলেনি?

অতশত না ভেবে সুমন সঙ্গে সঙ্গে গেল। নীলা সামনে আসতেই সুমন বলল, আপনি ডেকেছেন?

নীলা তাকাল। বারে, আপনি কেন? সবাই বন্ধু না আমরা? আমি তো তোমাকে প্রথম দিনেই তুমি বলেছি। কল্যাণ নাম দিয়ে নাম ধরে ডেকেছি না?

সুমন লাজুক চোখে তাকিয়ে এবার বসল। নীলা বলল, না ডাকলে বুঝি আসতে নেই?

তবু কিছু বলল না সুমন। শুধু বলল, সময় পাই না।

আমি ভাবলাম তোমার সেই মাস্টার মশাইকে রিকশয় দেখে ভয়ে বোধহয় আর আস না। নীলা হেসে বলল, সেদিন কিন্তু খুব সাহস দেখিয়েছিলে।

তোমরা তাহলে রাস্তায় ঘোর। সুমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল।

নীলা ফস করে বলল, কোন কোন রাস্তা ইজারা নিয়েছে বল, সে সব রাস্তায় তাহলে ঘুরব না।

গলা ছেড়ে এবার মহিম হেসে উঠল। বলল, উনি রাজকার্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

আরো লজ্জা পেল সুমন। বলল, তা কেন, কিছু না কিছু একটা কাজ থেকেই যায়। অনেকদিন তো ছিলামই না এখানে। বেড়াতে গেছলাম বেনারসে।

তোমার লেখা পড়লাম একটা ছোটদের পাতায়। মহিমকে কথায় কথায় বললাম সেদিন।

তাই তো ধরে আনলাম। রোল টেন কুতকুতে চোখে সুমনকে দেখল। দেখে বলল, টুকিসনি তো?

নীলা একটু গম্ভীর হল। বলল, কী হচ্ছে যা-তা। তারপর উচ্ছল গলায় বলল, একদিন দেখলাম তোমায়।

কোথায়?

রবীন্দ্রসদন থেকে আমরা ফিরছিলাম, দেখলাম তুমি আপন মনে হেঁটে যাচ্ছ, গীর্জার সামনে দিয়ে। একটা বই হাতে ছিল তোমার।

নীলা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। থেকে বলল, আমি ছবি আঁকতে ভালবাসি। হবি আমার। তুমি ড্রামা দেখ না?

দেখি।

নীলা বলল, রবীন্দ্রনাথের প্রায় নৃত্যনাট্যগুলো আমার দেখা। আমি করেওছি। চণ্ডালিকা হবে দিদির ক্লাবে শীগগীর। আমি করব।

বাঃ! সুমন বিস্ময় প্রকাশ করল প্রথমে, তারপর বলল, খুব ভাল। কী করবে চণ্ডালিকায়?

মহিম এতক্ষণ বোকার মত চুপচাপ বসেছিল। ফিল্ম দেখিস না?

কম।

নীলা হাসল। হেসে বলল, তোমাদের মত অত বখে যায়নি ও।

না, নয়? 'নয়' শব্দটা বেশ লম্বা করে উচ্চারণ করল মহিম। না আবার? এখনো তো বয়েস হয়নি কিছু জানবার, শেখবার।

বয়েস যদি একটা ফ্যাক্টার হয়, তবে তোমার আরো কম জানার কথা ছিল। জানা আর পেকে যাওয়া এককথা নয়। জানা মানে জ্ঞান আর পেকে যাওয়া মানে নোংরামী, অসভ্যতা। নীলা বক্তৃতার ঢঙে বলল।

রুদ্র এতক্ষণ চুপচাপ বসে শুনছিল। বলল, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি না, ভাব দেয় অনেকে। পেলে কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে খায়।

ভাল। নীলা ওইটুকু বলে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল একটা সুন্দর বাঁধানো-হাতে লেখা ম্যাগাজিন নিয়ে। বলল এর ডেকরেশন সব আমার। ছবিও আছে দুটো। তারপর একটা পাতা খুলে দেখিয়ে বলল, এটা আমার ছবি,• ফটো দেখে দেখে এ'কেছি। হাসির রেখা, ঠোঁটে রেখে বলল, এই বয়েসের স্মৃতি, বড় হলে দেখব।

সুমন হাতে নিল ম্যাগাজিনটা। ওল্টাল। তারপর নীলার ছবিটা দেখতে দেখতে বলল, তাজমহলও স্মৃতি। কিন্তু এই সৌধের চাইতে মানুষকে আমি আরো বড় বলে ভাবি। এই ছবির মেয়েটার চাইতে ছবির শিল্পীকে আমি আরো বেশি মূল্য দিই।

নীলা ঠিক ধরতে পারল না কথাটা। অত বুঝল না। শুধু হাসি হাসি মুখে তাকাল।

মহিম কী একটা বলতে যাচ্ছিল, সুমন বলল, তোমার হাতে আঁকা ছবি আমাকে একটা দিও, আমি কাগজে দিয়ে আসব। আমার চেনা আছে। লিখি মাঝে মাঝে, ছোট কাগজ অবিশ্যি।

বাব্বা! আমি যেন বড় কিছু আঁকিয়ে?

আমিও কোন রবীন্দ্রনাথ নই। তুমি আঁক, আমি লিখি, ভাবনা আমাদের এক ধরনের। তাই বলছি।

বেশ। নীলা ছোট করে উত্তর দিয়েছিল। ওসব লেখাটেখা আমার ভাল লাগে না। রেজাল্ট বেরুলে মড়া কাটব আমি। রুদ্র বলেছে।

এতক্ষণ এইসব ভাবতে ভাবতে কেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সুমন। এখন যেন সংবিত ফিরে এল। জানলা দিয়ে এখন আকাশে তাকাল। সুমন বুঝল না রাত এখন কত, শুধু বুঝল ভাবতে ভাবতে মাঝরাত পার হয়ে গেছে। কী বিপুল নক্ষত্র আকাশময় ছড়িয়ে। সব কেমন নিঝুম।

আকাশ থেকে চোখ তুলে নিয়ে ঘরে তাকাল। সারা ঘর অন্ধকার। নীলার মুখ, প্রতিটি অবয়ব সে ওই অন্ধকারের ভেতর দেখল। যেন অন্ধকারের ভেতর ঠিক দুজনে মুখোমুখি বসে আছে। দেখতে দেখতে আবার পেছনের দিকে নামল। আবার ভাবল—

ছাড়ি ছাড়ি করেও তখনো স্কার্ট ছাড়েনি নীলা। নীলার চেহারা, সুন্দর চোখ, ওর ভুরু এবং শরীরের নিপুণ ইঙ্গিতগুলো কেমন একটা নেশা জড়িয়ে দিত। মাঝে মাঝে শাড়ি পরলে শরীরের প্রতিটি ভাঁজ খুব উদ্ধত মনে হত। নীলা মাথা নিচু করলে রুদ্র বলত, আমি ডাক্তার হব নীলা।

হিমানীশ বলত, ইঞ্জিনিয়ার।

সুমন চুপ করে থাকত।

হঠাৎ চমকে উঠল সুমন, হরিধ্বনি দিচ্ছে বাইরে। কারা এই রাত্তিরে শব নিয়ে চলেছে।

সুমন চোখ বুজল এবার। চোখ বুজে পড়ে থাকল। হরিধ্বনি আর যখন শোনা গেল না তখন চোখ খুলল। আবার ভাবল, দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম-বর্ষা চোখের ওপর দিয়ে কত চলে গেল। দেখেছে, শীতে তাদের বাড়ির বাইরে একটা মরা নিমগাছ নতুন পাতায় সাজত। বর্ষায় জল দাঁড়াত গলির মুখে। গ্রীষ্ম এসে ফুল ফোটাত নীলাদের গেটের ওপর বোগেনভিলিয়া গাছে। টবে টবে।

চা শেষ করে নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে গত সন্ধ্যায় রুদ্র জিজ্ঞাসা করে বসল, নীলার সঙ্গে তোর চলছে কেমন?

ঠাট্টা করেছিল সুমন, কই আর চলছে।

লুকোচ্ছিস। ধোঁয়া ছেড়েছিল রুদ্র। সবকিছু টের পাই আমি। মহিম বলেছে।

তবে তো সব জানিস। সুমনও ধোঁয়া ছেড়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুদ্র বলেছিল, ঘরে তোল এবার। মাঠে ময়দানে চরে খেয়ে আর কতকাল চলবে? মেয়েটা ভাল। তোর



চাইতে কত বড় ঘরের, কিন্তু আশ্চর্য একটা নরম মন আছে। তোর প্রতি একটা সফট কর্নার আছে। পরপর কয়েকটা টান দিয়ে খানিক চুপ করে থাকল। তারপর নিচু গলায় বলেছিল, হয়ত ভালওবাসে।

তোর ওই সার্টিফিকেটটার অভাব ছিল।

না না ঠাট্টা নয়। একটু থেমে আবার বলেছিল, কে যে কী হয় জগতে কে বলতে পারে বল? শ্বশুরমশাইয়ের নজরে পড়লে, আমাদেরই হয়ত তখন চিনতে পারবি না।

ঠিক। সুমন ঠাট্টা করল, ভগবান যেন এমন আমার সুমতি দেন।

পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা রে। কোথায় কে বাঁধা পড়ে কে জানে!

তুই বিয়ে করবি না? পাত্র হিসেবে তোর সঙ্গে তো আমার তুলনা হয় না।

তা অবিশ্যি ঠিক। মুখের ওপর আবার উত্তর দিল রুদ্র। মুখের ভেতর থেকে বেশ খানিকটা ধোঁয়া হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বলল, দেখ, ওসব ডিগ্রী-টিগরির কোন দাম-ফাম নেই। আজকের জগতে সব মূল্যহীন। মর্গের সামগ্রী। মূল্য অর্থের। সম্মান, সোসাইটি, এনজয়মেণ্ট, মেয়েছেলে সবকিছুই টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। ফলে কী লাভ বিয়ে করে! দরাজ গলায় সাফাই করল রুদ্র, বলল, যে দেশে দুধ এত সস্তা সে দেশে গরু পোষার ঝামেলা নিয়ে লাভ কী?

এরপর হাতের সিগারেট মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। পা দিয়ে ঘষে সিগারেটটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, অদিতির খবর কি?

ভালই।

লালি?

ও তো সেই ভুগছে।

অদিতির বিয়ে-টিয়ের কী হল?

করবে না।

সে কী রে, করবে না? রুদ্র হাসল আবার গলা ছেড়ে। মেয়েছেলে বিয়ে করবে না এই প্রথম শুনলাম। চেষ্টা করিস না তোরা। ঠিক আছে, ছবিটা আমার হয়ে যাক, আমি দেখব।

কথাটার ঠিক অর্থ ধরতে পারল না সুমন, 'আমি দেখব'। রুদ্র নিজে করবে না রুদ্র চেষ্টা করবে, এই নিয়ে বেশ ভাবল।—শুয়ে শুয়ে এখনো ভাবল। এই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আবার আকাশে তাকাল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পাঁচ

দেখতে দেখতে বর্ষা কেটে গেল। শরতের আকাশে পরিব্যাপ্ত জ্যোৎস্না কী নির্মল। খণ্ড খণ্ড মেঘের পুঞ্জ, পেঁজা তুলোর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে চোখের ওপর। বড় যেন ভাল লাগে নীলার এই মেঘ, এই রোদ্দুর। সুমনকে আরো কাছের, আরো নিজের করে পেতে ইচ্ছা করে তখন।

প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, সেই স্মৃতি, কিশোর বেলার সেই ঘটনা যেন এই মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ বুজলেই চোখের ওপর উঠে আসে। লাজুক নম্র ছেলেটি, ধীর স্থির চাওনি, যেন নীলার চোখের ওপর চোখ তুলে তাকাতেই পারত না।

অথচ এখন? কী আশ্চর্য কথা বলে। নীলা এসব ভাবছিল, ছোটবেলাকার সব স্মৃতি মনে পড়ছিল। উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে দু হাতের তালুতে চিবুক রেখেছে নীলা। আরো যেন অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরেটা। কেমন পুলক অনুভব করছিল। বৃষ্টি নামলে ভাল হত। যেন আরো এখন আনন্দ পেত নীলা।

মা ঢুকলেন ঘরে। কিরে ঘুমোসনি?

তেমনি বুক ঘষে একটু নিচে নেমে তাকাল নীলা।

জানলাটা খোলা?

ছাট আসছে না তেমন।

ঘুমোচ্ছিস ভেবে এলাম, ভাবলাম জানলা খোলা, বিছানা ভিজছে।

না।

না তো কি? মা এগিয়ে এলেন। জানলা বন্ধ করে দিলেন।

বোসো না। নীলা খোলা বইটা হাতে তুলল। তুমি শোওনি?

না। ও বাড়ির দিদি এসেছিলেন। কথা বলছিলেন।

কী বলছিলেন? নীলা অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

তোর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা। ওঁর বোনের ছেলেটি এবার সি এ পাশ করল। আছেও একটা বিরাট জায়গায়। টাটা না দুর্গাপুরে যেন। শিগগির বিলেত যাবে।

বাঃ! নীলা বলল। ভাল ছেলে। তুমি কথা দিলে না কেন? নীলা মুচকি হাসল, তারপর মাকে হাত বাড়িয়ে টেনে বিছানায় বসিয়ে বলল, সত্যি, তোমরা যে কী আমার জন্য ভাব। দিদির মত আমাকেও তাড়াবে ভাবছ!

তাড়াব, ইচ্ছা করলেই তো আর তাড়ানো যায় না। যার তার সঙ্গে তো আর হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি না?

মা বসলেন। কান পেতে শুনলেন, বাইরে গোঁ গোঁ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে আকাশ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার চকিত আলোর রেখা এই ঘরের ভেতর প্রতিফলিত হচ্ছিল। মা নীলার গায়ে হাত রেখেছিলেন, গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন। তারপর একসময় বললেন, হ্যাঁ রে নীলা—

কি?

সুমন নাকি চাকরি করে না?

নীলা চুপ করে থাকল। তারপর বলল, তাইতো জানি।

চলে কী করে?

এই দেখ, নীলা সুর করে কথাটা বলল। কার চলে আর কার চলে না, গোটা ভারতবর্ষে তার তালিকা প্রস্তুত করা আমার ডিউটি নাকি?

নীলা খেলার ছলে মায়ের আঁচল টেনে চোখে চাপা দিল।

রামজনম চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। বৃষ্টি একটু কমেছে। তবে ধরেনি। নীলা জানলাটা খুলে দিতে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এল। বেশ ঠাণ্ডা বলে মনে হল নীলার। ঘড়ি দেখল, দেখে কেমন একটু অস্বস্তি অনুভব করল। নীলা বুঝল, কলকাতা ডুবে গেলেও সুমন ঠিক এসে দাঁড়াবে স্টেশনে।

মা চা-এ চুমুক দিলেন। চা নে।

নীলা হাত বাড়িয়ে চা-এর কাপটা নিল।

মা চা-এ চুমুক দিয়ে একটা বিষম খেলেন। নীলা রসিকতা করল, বলল, সত্যি সত্যি, দেখ ফলে যাবে, বিষম খেয়েছ তো, দেখ, মিলে যাবে।

মা মেয়ে দুজনেই চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। দুজনেই কী যেন ভাবল। তারপর মা নিজেই বললেন, জীবনে কোনদিন মানুষকে ব্যথা দিস না, দিতে নেই। সুমনকে যদি তোর পছন্দই হয়, আমার কেন আপত্তি থাকবে। তোমার বাবার কথা অবিশ্যি বলতে পারি না। বাবা তো বলেন, ব্রতীশ, রুদ্র, মহিম, চন্দন তোমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু আছে। তুই কিন্তু খুব গুণের মেয়ে তোর বাবার কাছে।

সে কি? আমি ভাল সাজগোজ করি না, দোকান থেকে চুল বাঁধিয়ে দিদির মত সারা রাত ইজিচেয়ারে আড় হয়ে শুয়ে কাটাই না, পার্টিতে যাই না, বেলবটস পরি না, বাবার বিশেষ বিশেষ বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে হ্যামপর্ক খেয়ে আসি না, তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিই না, সিনেমা থিয়েটারে সঙ্গ দিই না, ড্রিংক-ককটেলের গল্প শুনি না, তারিফ করি না, আমি গুণী হলাম কিসে?

যুগ বদলাচ্ছে, এসবেরও প্রয়োজন আছে। ঠিক সমর্থন নয়, আবার প্রতিবাদও নয়, এমন গলায় মা উচ্চারণ করলেন কথাগুলো।

নীলা জানলায় তাকাল। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। তেমনি বাইরে তাকিয়ে থেকেই বলল, আমি একটা মানুষ চাই মা, বিত্তবান জানোয়ার না। তোমরা বিত্তবান খোঁজ, মানুষ খোঁজ না।

তুই ভালবাসিস সুমনকে? মায়ের আঁচলের প্রান্তভাগটা চেপে নীলা শুয়েছিল। মা ওকে আলতো সরিয়ে আঁচলটা কাঁধে তুললেন। না রে?

মুখ গুঁজে শুয়ে আঁচলে চুল জড়াল নীলা। সোজা হল না নীলা। তেমনি কুঁচকে কুঁকড়ে শুয়ে থেকেই গুনগুনিয়ে বলল, জানি না।

আমি জানি। আমি তো মা। রামায়ণ মহাভারতের যুগে তো বাস করি না যে তোর পছন্দকে আমি কদর দেব না। তোর রুচিজ্ঞান আমার কাছে মর্যাদা পাবে না, একথা তুই ভাবছিস কী করে?

ভাবছি না মা, আমি তো চিনি তোমাকে। শিশুর মত জড়িয়ে ধরল এবার মাকে নীলা। ব্যাস।

মা হাসি-হাসি মুখে বাইরে চলে এলেন। বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালেন।

রামজনম বলল, আজ আর আইসক্রীম হবে না মাঈজী। ফ্রিজটা চলছে না, কারেন্ট নেই। ছোট দিদিমণির বন্ধুরা আসবে, বলে গেছে আইসক্রীম বানাতে।

ছোট দিদিমণি মানে কম্পা। কনভেন্টে পড়ে। বয়েস হিসেবে নীলার চেয়ে অনেক ছোট, প্রায় সাত বছরের। এখনো কিশোরিত্ব ঘোচেনি, কিন্তু দেখলে পরিণত যুবতী বলে মনে হয়। চুলে শ্যাম্পু করে, স্কুলের ড্রেস ছেড়ে ঢিলে পাতলুন আর ওপরে কখনো পাঞ্জাবি, কখনো টাইট গেঞ্জি পরে বুকের ওপর বর্ডারওলা। একটা ঢাউস ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যা হয়ে গেলে।

নীলা একদিন বলেছিল, কী এত কাজ ফিরতে এত দেরি হয়? কলেজে ঢুকলে তো ফিরবিই না হয়ত।

মা বললেন, দিদিমণি যখন হুকুম করে গেছে, তখন না হয় একটু যাও। গড়িয়াহাট রোডের দোকান থেকে কিনেই নিয়ে এস। একটু যাও বরং, চাইনিজ খাবারও একটু কিনে আন সেই সঙ্গে। নীলা পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু মায়ের হুকুম শুনল। বলল, মা, আমি একটু বেরোচ্ছি। নীলা বেরিয়ে গেল।

সাজগোজের বালাই নেই তেমন। আলতো পাউডারের পাফ বুলিয়েছে গলায়, ঘাড়ে। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মত গোল কাচের সবুজ মালা। কাঁধে লম্বা স্ট্র্যাপের ব্যাগ। ঘাড়ের ওপর গুচ্ছ চুল একটা লেডিস রুমাল দিয়ে বাঁধা। হাতে নেলপালিশ নেই। পায়ের নখগুলো অলক্তক। একটা ফোল্ডিং ছাতা ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ির সঙ্গে লাইট পিঙ্ক কালার ব্লাউজ ম্যাচ করে পরেছে নীলা। শাড়ি ব্লাউজের রঙের মত একটা গোলাকার টিপ কপালে। বড় উজ্জ্বল হয়ে টিপটা কপালের ওপর ভাসছে।

বৃষ্টির জল কোথাও তখনো দাঁড়িয়ে। কোথাও লাফিয়ে, কোথাও একটু উঁচু হয়ে, পায়ের কাপড় আলতো কোথাও গুটিয়ে নিয়ে নীলা হাঁটল। এসে দাঁড়াল বালিগঞ্জ স্টেশনের দোতালায় ওয়েটিং রুমের বারান্দায়।

দোতালার স্টেশন বারান্দায় এসে দাঁড়াল নীলা। ঘড়ি দেখল, দেখে বুঝল, মিনিট দশেকের মত এখনো বাকি। কাঁকুলিয়ার রেলগেট পার হয়ে সোজা লাইন ধরে আসে। নীলা ভেবেছে কতদিন, সে ঘড়ি ধরে মিনিট সেকেণ্ড মিলিয়ে দেখবে কতক্ষণ সময় লাগে এইটুকু আসতে। লাইনের ওপর দিয়ে স্লিপার ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটে সুমন। তখন সব ভুলে যায়। দু মিনিট তের সেকেণ্ড দেখতে দেখতে সুমনকে দেখে। সেই ফাঁকে সেকেণ্ডের কাঁটা পালায়। সব ভুলে যায়।

নীলা দেখল সুমন রেলগেটের বাঁক পার হয়ে লাইনে নামল। হাঁটছে। দেখল পায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লক্ষ করে করে হাঁটছে। প্লাটফরমের কোনাকুনি এসেই দেখল দূরে, বারান্দায়। নীলা হেসে হাত নাড়ল। সুমন আরো জোরে হাঁটল। পায়ের দিকে লক্ষ না রেখে একসময় উঠে এসে পাশে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, রোজ ভাবি, লেভেল ক্রসিং-এর মুখ থেকে এই পর্যন্ত কটা স্লিপার পাতা গুনব। কোনটায় লেখা সিক্সটি, কোনটায় সেভেনটি টু, কারো পিঠের ওপর সেভেনটি ফোর। ব্যস, যেই তোমাকে দেখলাম অমনি সব গুলিয়ে গেল। কটা গুনেছিলাম তাও ভুলে গেলাম। তোমাকে দেখতে দেখতে হাঁটি, পাতা কাঠগুলোর বুকের ওপর পাও ঠিক পড়ে না অনেক সময়। দেখ একদিন, ঠিক গুনে তোমাকে বলব।

নীলাও হাসল, আমি একদিন দেরি করে আসব। সেদিন তুমি গুনে উঠতে পারবে।

এই না, তাহলে তো একেবারেই না। যা-ও বা এখন পারি তোমাকে দূর থেকে না দেখলে তাও পারব না।

কেন? নীলা ব্যাগটার ফিতেটা কাঁধের ওপর লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দেখতে না পেলে আমি কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। রাগ হয়, কত সব ভাবনা হয়। আমি কিন্তু তোমার আগে অনেকদিন এসেছি, চেষ্টা সেদিনও করেছি। পারিনি।

আমিও পারি না। আমিও ভাবি গুনব, তোমাকে দেখলেই কেমন একটা হয় ভেতরে। সব গুলিয়ে যায়, সেকেণ্ডের কাঁটাটা যা জোরে জোরে লাফায়। তোমাকে দেখলেই মনে হয়, সেকেণ্ডের কাঁটাটা সেকেণ্ডে তিনবার লাফাচ্ছে।

দুজনে গলা মিলিয়ে হাসল। হেসে সুমনই কথা বলল প্রথম, চল না, এই ট্রেনে চেপে একটু কোথাও যাই, তিন চারটে স্টেশন ছাড়িয়ে নামব। একটু নিরিবিলির ভেতর। অন্তত এই ধুলোধোঁয়ার হাঁফ ধরানো অবস্থাটা থেকে একটু দূরে। গ্রামে।

চল।

থাক। সুমন বলল, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। তোমার কষ্ট হবে।

হোক। তোমার ভাল লাগবে। তারপর অনেক কাছে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার ভাল হলে, তুমি খুশি হলে আমার আনন্দ। আমারও ভাল লাগবে।

কী ভেবে সুমন বলল, তবে টিকিট কিনে আনি, দাঁড়াও। কিন্তু টিকিট কিনতে এসে জানল, শিয়ালদা থেকে এখন ট্রেন ছাড়বে না। লাইনে গণ্ডগোল। সুমন বলল, কোথায় যাবে?

তুমি বল। নীলা বলল।

গড়ের মাঠ?

ভিজে তো। নীলা তাকাল। বেশ বেশ। তাই।

গড়ের মাঠের ঘাসগুলো আমাদের চিনে ফেলেছে। সুমন হাসল।



ভাববে ভিজেও রেহাই নেই।

তবে গঙ্গার ধারে? নীলাও হাসল।

বেশ। সুমন ওকে সমর্থন জানিয়ে বলল, তাই চল। গঙ্গার ধারটা অনেকদিন আমাদের দেখেনি।

বাসে উঠল ওরা। কিন্তু পাশাপাশি বসার জায়গা পেল না। নীলার কোন রকমে লেডিস সিটে জায়গা হল। সুমন দাঁড়াল।

গেটের মুখেই বেজায় ভিড়।

বাস থেকে নেমে হাসি গল্পে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এসে বসল দুজনে। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা কার্গো শিপ গঙ্গার ওপর নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। কিছু মহাজনী নৌকা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর ওপর কিছু কাপ্তান ছোঁড়াছুঁড়িকে হাওয়া খাওয়ার জন্য ছোট্ট ছাউনিঅলা নৌকার লোক ডাকছে। সওয়ারি খুঁজছে।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে থাকল। তারপর সুমনই কথা বলল প্রথম, তোমাকে দেখব, না নৌকা দেখব কথা বলব, না চুপ করে থাকব ঠিক যেন ভেবে পাচ্ছি না।

নীলা বলল, চুপ করে থাকো।

তখন মনে হয় রাশিকৃত চিন্তাভাবনা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলতে চাইছে।

তাহলে, নীলা একটু ভেবে হাসল, হেসে বলল, তবে নৌকা দেখ।

ধ্যেৎ।

তাহলে মাঝে মাঝে আমাকে দেখ আর কথা বল?

সুমন বলল, মাঝে মাঝে কেন, সবসময় তোমাকে দেখতে ভাল লাগে, তখন কথা বলতে নয়। আবার কথা বলতে মাঝে মাঝে। তখন তোমায় না দেখলেও চলে।

বেশ, তাহলে কথাও বল না, দেখও না। আমি উঠছি।

সুমন গলা তুলে হাসল, হেসে হাত ছুঁল। তুমিই বল।

কী কথা, আমার দিন রাত্রিকে ঘিরে রাখে কে, এইসব কথা?

সত্যি কথা। যারা এই ধরনের কথা বলে, হয়ত তারা কিছু মানে খুঁজে পায়। আমাদের কানে ন্যাকা শোনায়। সব মিথ্যে মনে হয়। সুমন ওর হাতে ছুঁয়েই থাকল। কিন্তু এই ধর, এই আসি যাই, কথা বলি, ঘুরি, গল্প করি কেন বলত? কোন মানে নেই?

নীলা তাকালে সুমন বলল, ব্যস, তার বেশি কিছু ভাবতে গেলেই আমি কেমন ছিটকে পড়ি। পিছিয়ে আসি। কেন বলত?

নীলা ওর হাত সরিয়ে দিল। দিয়ে মাথা হেঁট করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বলল, সত্যি, বহুদিন এর উত্তর আমিও তোমার কাছে চাইব ভেবেছি, কিন্তু পারি না। এইসব ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে যায়। কে যেন গলা চেপে ধরে।



আরো শক্ত মুঠোয় আঙুল কটা চেপে ধরল সুমন। অথচ না দেখলে থাকতেই পারি না। সুমন বুঝল আলোচনাটা বড় কেমন জটিল হয়ে পড়ছে, পরিবেশটা জটিল হচ্ছে। তাই হালকা করতে জোরে জোরে হাসল। বলল, ফুচকা খাবে?

নীলা মাথা নাড়ল। না।

তাহলেই বোঝ, তুমি ঠাট্টা করছিলে, কিন্তু এখন বল আমার দিনরাত্রিকে ঘিরে থাকে কে? বল?

নীলাও হাসল।

সুমন বলল, দেখ, নীলা, এতদিন তোমাকে বলিনি, বলতে পারিনি। তবু—

নীলা তাকাল। কী—

হেড মাস্টারমশাই নিভৃতে আমাকে ডেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তা সে কত বছর হবে বলত? সুমন নিজেই হিসেব করে বলল, আমরা তো স্কুল ছেড়েছি বছর আটেক হয়ে গেল। না?

হুঁ।

আমার হাতে বেত দিয়ে বলেছিলেন, যা সত্য, অবিকৃত তা স্বীকার করতে পাপ নেই। আজ স্বীকার করছি আমি, আমি বেঁচে নেই, একে বাঁচা বলে না। বল তুমি, আমি আমার অক্ষমতা স্বীকার করছি। তুমিই বল, এখনো আমি তোমার সঙ্গে এগোব?

বাবু চা, গরম চা। হাতে নল বসানো পেতলের পাত্র, উনুনের ওপর বসিয়ে পাত্রটা লোকটা বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে। রুজি রোজগার করছে। সুমন বলল, চা খাও।

লোকটা ভাঁড়ে করে চা দিলে সুমন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, তোফা তোফা। টপ একেবারে। তোমাদের একশ টাকা কিলোর পটের চা-কেও হার মানায়। কী যেন একটা ইঙ্গিত করল সুমন। খেয়ে দেখ।

নীলা ব্যাগ খুলে পয়সা দিতে যাচ্ছিল, সুমন বাঁ হাত দিয়ে হাত চেপে ধরল, এই না।

সুমন পয়সা দিল। লোক চলে গেলে সুমন বলল, তুমি সত্যি কথা বলতে পারলে না, সাহস নেই। তারপর চাটুকু শেষ করে ভাঁড়টা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পাছে সত্যি বললে আঘাত পাই? তাই পার না। ভাঁড়টা একটু ভেসে থেকে টুপ করে জলের ভেতর ডুবে গেলে বলল, আমাকে তুমি বোধহয় করুণা কর, না? চা-টাকে চা ভাবলে আর খাওয়া যায় না. এ সত্যটুকু বলার সাহস নেই তোমার।

তবু কথা বলল না নীলা।

আমারও নেই। সুমন বলল। থাকলে তোমার মনোরম দিনগুলো এভাবে চুরি করতাম না। আমি বোধহয় বড়দরের ডাকাত নই তাই সাহস আমার কম।

চল উঠি। নীলা বলল। ডান হাত ঘুরিয়ে চৌকো ঘড়ি দেখল।

কত? সুমন জিজ্ঞাসা করল। তারপর নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ছুঁল। চল।

হাঁটল দুজনে। জোড়া জোড়া তরুণ-তরুণী এধার ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। নির্দ্বিধায় বসে আছে পাথরের মত। সুমন বলল, এদের দেখলে আমার খুব দুঃখ হয় এদের মত হতে পারি না বলে।

এতক্ষণ পরে নীলা বলল, দুঃখ তোমার অনেক। হাসল, খুব বাহাদুর। হতে চাইলেই হতে দিচ্ছে কে? দুঃখ তো হবেই। জিব বের করে আবছা আলোয় নীলা ওকে ভেঙাল।

নীলা ওর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামাল। তারপর আকাশের তাকিয়ে বলল, এই দেখ দেখ, চাঁদের আলোয় চাঁদের চারপাশে ওই মেঘটুকু দেখ। অদ্ভুত না?

সুমন বলল, ওই চাঁদটাকে রাত্তিরে আমরা দুজনেই দেখব, অথচ দুজন দুজনকে দেখতে পাব না। কত দূরে থাকব। সুমন এতক্ষণ তাকিয়েছিল। চাঁদের চারপাশে মেঘের জটলা, শুধু চাঁদকে ঘিরেই। চাঁদের আলোয় আবিরের রঙ নিয়েছে, হালকা অভ্র ছড়িয়ে রেখেছে কেউ যেন তার ওপর। চারপাশ মুক্ত। নির্মল। চাঁদের সুষমায় মেঘের রঙ হারিয়ে গেছে। সুমন বলল, অপূর্ব।

দুজনে হাঁটল। সবুজ ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিল দুজনে। সুমন এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এই চির নতুন পৃথিবী—রূপ-রস-গন্ধ, এই অকৃপণ প্রকৃতি—অপার মহিমা, এই মানুষ—প্রীতি-প্রেম-ভালবাসা, এসবের আজ যেন কোন মানে নেই। নীলার চোখে তাকিয়ে বলল, কই, হাঁটো।

হাঁটতে হাঁটতে সুমন বলল, মাংসের দোকানে সাজান কাটামুণ্ডুর মতন শূন্য দৃষ্টিতে কিছু লোক শুধু দেখছি। কী জান?

নীলা তাকাল।

মনে হয় প্রতিবাদ করি। চিৎকার করি। আবার নতুন করে পৃথিবীটাকে সাজাই।

নীলা চোখ নামাল।

তখনি মনে হয় কত ক্লীব আমরা, কত নির্জীব, অসহায় আমরা। মনে হয় হাত পা বাঁধা বধ্যপ্রাণীর মত কোন মহাকালের মন্দিরে পড়ে আছি।

দাঁড়ালে কেন? নীলা ওর হাত ধরল।

বেশ জোরে জোরে হাঁটল এবার সুমন। এর পরিবর্তন চাই নীলা। এই জালের ভেতর থেকে সকলকে ঠেলে বাইরে বের করে আনতে হবে। একসঙ্গে সবাই একই আকাশের চন্দ্রসূর্যের তলায় দাঁড়াতে হবে।

জোরে জোরে হাঁটছিল, তারপর একসময় মাঠ পার হয়ে এসে রাজভবনের মুখে এসে পড়ল। সুমন এতক্ষণ চুপ করে হেঁটেছে। মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কম কথা বলেছে। নীলা প্রায় কথাই বলেনি। সুমন বলল, এস একটা ট্যাক্সি নিই। অনেক রাত হয়েছে। ট্রামে বাসে ফিরলে তোমার আরো দেরি হয়ে যাবে।

এমন আর কী হবে রাত?

এত সঙ্কোচ করছ কেন? তোমাকে এইটুকু পথ ট্যাক্সি চড়াতেও পারব না আমি? হাতের কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে সুমন দাঁড় করাল। ট্যাক্সির দরজা খুলে সুমন বলল, ওঠ। খুব ঘন হয়ে পাশাপাশি বসল দুজনে। এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট বার করল সুমন। ধরিয়ে বলল, ইভের ফল খাওয়া জান তো, নিষিদ্ধ ফল খেয়ে কী অঘটনই না ঘটে গেল। ধোঁয়া ছেড়ে জিবের ওপর একটা শব্দ তুলল সুমন। ইস! কী কুক্ষণে যে তুমি স্কুলে রোল টেন-এর দেওয়া আম খেয়েছিলে?

সমাপ্ত

ছবি : ধ্রুব রায়

শ্যামা মা তুই মনের কথা বুঝিস ওরে কেমন করে
যারে খুঁজে সন্ধে হোল, এলি কি তুই সে রূপ ধরে
কত বার তোর এ দ্বারে হোল আমার আসা যাওয়া
আজ দেখি মোর মনের পালে লেগেছে কোন মায়ার হাওয়া
মাগো, হৃদয় তরী বাঁধব কোথায়
ভেবে না পাই কোন নোঙরে।
ধ্যানে জ্ঞানে ধর্মে কর্মে যারে আমি নিত্য পূজি
আজ দেখি মোর ডাইনে বাঁয়ে
সে যে আসে আমায় খুঁজি
মা তোর এ কোন লীলা জানতে তারে
মন যে আমার কেঁদে মরে।


ছবি: বালসারা

II
–ণ্সা ঃ জ্ঞা ঃ মা | পা পর্সণা ঃ ধা পা | –জ্ঞমা ঃ জ্ঞমা পণপা | জ্ঞা জ্ঞমা রা সা
–শ্যামা মা তুই | ম নে র ক থা | –বুঝিস ও রে | কে মন্ ক রে

II
–সসা মমা মা | মা পমজ্ঞমা পমা পা | –জ্ঞজ্ঞা মপা ণপা | জ্ঞা জ্ঞমা ররা সা ||
–যারে খুঁ জে | সন্ ধে হো ল | –এলি কি তুই | সে রূ পধ রে ||

[–পপা পা পা | মপাম পা জ্ঞা মা | –পপা ণণা ণা | –ণর্সা ণা র্সা
[–কত বা র | তোর এ দ্বা রে | –হোল আ মার | –আসা যা ওয়া

পণা ণা ণা ণপা | –ণর্সা ণা র্সা | –পণা র্সা র্রা | ণর্সা ণর্সা ণধা পা]
আ জদে খি মোর | –মনের পা লে | –লেগে ছে কোন | মা য়া রহা ওয়া]

– – পধা পধমা | –পপা র্সর্সা র্সর্রা | ণা ণধা ধপা পমা |
– – মা গো | –হৃদ য়ত রী | বাঁধ ব কো থায় |

II
–পণা ণধা পমা | জ্ঞমা মজ্ঞা মপা পা | –জ্ঞজ্ঞা মপা ণপা | জ্ঞা জ্ঞমা ররা সা ||
–ভে বেনা পাই | কোন নো ঙ রে | –এলি কি তুই | সে রূ পধ রে ||

দাদরা

– – র্সনা | নদা দপা পদা | জ্ঞপা — জ্ঞাগা জ্ঞা — গা
– — ধ্যা | নে জ্ঞা নে | ধর্ — মে কর্ — মে

– – ঋগা | গজ্ঞা জ্ঞদা দজ্ঞা | গা ঋা গা | ঋা সা — | সা মা মা
– – যা | রে আ মি | নি ০ ত্য | পূ জি — | আ জ দে

মা মা ০ | মা ০ জ্ঞা | মা গ — | গণা দা — | দর্সা নর্ঋা র্সা | না দা না
খি মো র | ডা ই নে | বাঁ য়ে — | সে যে — | আ সে ০ | আ মা য়

দা পা — |
খুঁ জি — |

কাহারবা

– — পধা পধমা | — পপা র্সার্সা র্সর্রা | ণা ণধা ধপা পমা | – পণা ণধা পমা
– — মা তোর | — একো নৃলী লা | জান তে তা রে | – মন্ যেআ মার

জ্ঞমা মজ্ঞা মপা পা | -- জ্ঞজ্ঞা মপা নপা | জ্ঞা জ্ঞমা ররা সা || II
কেঁ দে ম রে | — এলি কি তুই | সে রূ পধ রে ||

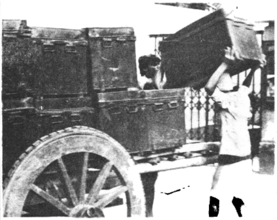
শিল্পী ঃ কুমারী ধান্নাওয়াজ কথা ঃ মিলটু ঘোষ স্বরলিপি ঃ ভি বালসারা

যাত্রার চাকা ঘুরেছে



আশ্বিন এসেছে। আশ্বিন শব্দটির মধ্যে কোথায় যেন একটা নতুন কিছু আসার ছন্দ আছে। আশ্বিন সঙ্গে করে এনেছে শরতের মেঘমুক্ত আকাশ। এনেছে কাশ বনে হাসি। ঢাকের বাদ্যি। খুশির হিল্লোল। অনেক কাজের মেলা। উৎসব। পার্বণ।

কলকাতার গোটা অঙ্গে যতই



সাজ-পোশাকের বাক্স যাচ্ছে গ্রীনরুমে

ক্ষত সৃষ্টি হোক, তবুও এখানে আশ্বিন আসে। শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত আসে। ঋতু বন্দনা হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপচারে।

বছর কয়েক আগেও এই আশ্বিনের প্রথম অথবা মধ্যভাগ থেকে পথ চলতে চলতে কখনও উত্তরে আবার কখনও দক্ষিণে কান পাতলে শোনা যেত ধ্রুপদ, ঠুমরী, গজল। শোনা যেত বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব, দবীর খাঁ সাহেব, প্রসূন ব্যানার্জি, সুনন্দা পট্টনায়ক অথবা রবিশঙ্কর, আলি আকবর, আমজাদ খাঁন, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, শান্তা প্রসাদ কিংবা লতা মঙ্গেশকার, রোশনকুমারীর মত শিল্পীদের সেতার সরোদের মূর্ছনা, নৃত্যের ছন্দ, তবলা-নুপুরের ধ্বনি, কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত। দেখা যেত এ-পার্কে সে-পার্কে এই সঙ্গীত সম্মেলন অথবা নাট্য সম্মেলন। এরূপর বঙ্গসংস্কৃতির মিলনমেলা বসত ময়দানে।

আসলে সংস্কৃতি প্রবহমান কলকাতা একদা সংস্কৃতির সম্ভার নিয়ে ঋতুতে ঋতুতে বলত, যার যা মন চায় তুলে নাও, মন ভরাও আমার এই রসের প্রবাহ থেকে! এখন কেন জানি না সেই কলকাতা, সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা ইদানীং অনেকটা নিঃস্ব হয়ে গেছে।

এখন এই কলকাতায় হবার মধ্যে হয় দুটি বইমেলা। আর এখানে-ওখানে প্যান্ডেল বেঁধে বা বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহে যাত্রা হয়। একদিন এই কলকাতায় মোটা অঙ্কে টিকিট কিনে এই সব সঙ্গীত সম্মেলন, নাট্য সম্মেলন দেখার যত অহঙ্কার ছিল, তেমন যাত্রার বেলায় ছিলই না। উন্মাদনা ছিল গ্রুপ থিয়েটারের ভিতর দিয়ে গণজাগরণ ঘটাবার। এখন ও সব অনেকটা ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। যদিও শুধু কলকাতা নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গে শৌখিন থিয়েটারের অভাব নেই।

এখন কলকাতার একটা মোটা মাপের অহঙ্কার যাত্রা দেখা, যাত্রা করানো। আরও একটা অহঙ্কার আছে, তা হলো যে মঞ্চে 'লোক শিক্ষে হয়' সেই মঞ্চে ক্যাবারে তুলে থিয়েটারের লক্ষ্মীকে যে যতটা শক্ত করে বাঁধতে পারে তার অহঙ্কার। হয়তো এ যুগেরই একটা ধর্ম পালন করছে মঞ্চের ক্যাবারে, কিন্তু যাত্রা আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে তেমন কোন ধর্ম পালন করছে না। আর তাই বোধ হয় যাত্রা এমন একটি চিত্তবিনোদন মাধ্যম যেটির প্রসার ও প্রচারেও দ্রুত লয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

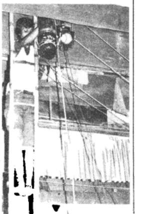
আশ্বিন আসে আর যাত্রার মরশুম শুরু হয়। যাত্রার পরিভাষায় এই মরশুম শুরুর অন্য নাম 'চাকা ঘোরা'। আনুমানিক ৫০-৫৫ জন শিল্পী-কর্মী-কলাকুশলী, সাজ-পোশাকের বিশাল বাক্স-প্যাঁটরা, মাইক, লাইটের সরঞ্জাম, মাথা পিছু একটি করে বেডিং আরও আনুসঙ্গিক অনেক কিছু গর্ভে ধারণ করে যেদিন চিৎপুরের থেকে লাক্সারী বাসগুলো একে একে চাকা ঘুরিয়ে দেয় গ্রামগঞ্জের উদ্দেশ্যে, মূলত সেদিন থেকে যাত্রার মরশুম শুরু।

মরশুম শুরুর ঠিক আগে বেশ কিছুদিন কলকাতার বিলাসবহুল প্রতিটি রঙ্গমঞ্চে চলে যাত্রার 'খেপ'। এই খেপের ভিতর দিয়ে যাত্রা-প্রযোজকেরা একটা বড় কাজ সমাধা করেন। তা হলো তৈরি পালাকে বার বার ঝালাই করে নেওয়া। গ্রামগঞ্জের আসরে পালা তুলে দেবার আগে পালিশ করে উজ্জ্বল করে নেওয়া। এই সুযোগ নেয় কলকাতার অনেক ক্লাব-সমিতি। 'সিকিবাদ'-এর গান, আর যানবাহনে খরচ কম বলে, ক্লাব সমিতিগুলোর অনুরোধ রক্ষা করেন যাত্রার মালিকরা। নির্দিষ্ট বায়না-অঙ্কের অনেকটা ছাড় দিয়ে শো করেন। পালার বাঁধুনি এতে অটুট যেমন হয়, তেমনি প্রতিদিনের খরচের অঙ্কটা অনেকটা কমিয়ে নেওয়া যায়।

যাত্রার এই 'খেপ' খাটার দরুন কলকাতার সবগুলি রঙ্গশালা এখন জমাট। রঙ্গশালার প্রবেশ-দ্বারগুলো এখন হরেক রকম পোস্টারে আর টিকিটঘরের কাউন্টারের টেবিলগুলো টিকিটে টিকিটে ছয়লাপ।

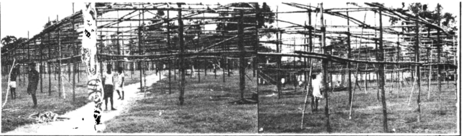
চিৎপুর থেকে অথবা রিহার্সাল বাড়ি থেকে বাক্স-প্যাঁটরা যথা সময়ে থিয়েটার বাড়িগুলোতে পাঠাতে বাসের পরিবর্তে ঠেলাই তৎপর। কিন্তু এই বাক্স প্যাঁটরা যারা মাথায় করে গাড়ি থেকে পৌঁছে দেয় গ্রীনরুমে তারাই আবার মাথায় করে ফিরিয়ে আনে গাড়িতে, তারপর পৌঁছে দেয় যথাস্থানে। যাত্রার চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বহু শিল্পী-কর্মী-কুশলীদের মাসিক বেতন চালু হয়। ঘাম ঝরিয়ে কাজ করার মরশুম আসায় তাদের মুখে হাসি ফোটে। 'সিকিবাদ'-এর পারি-শ্রমিক এরা পায়, সেটাই বড় কথা। এই মুহূর্তে যাত্রার চাকা ঘুরেছে!

ইতিমধ্যে মরশুম শুরু হয়েছে। যাত্রা-প্রীতির ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মরশুম শুরুর সূত্রপাত এবার এক



পালা আরম্ভের আগে আলোর সরঞ্জাম প্রস্তুত হচ্ছে





সঙ্গে একই তারিখে দুটি পাশাপাশি প্যান্ডেলে ঘটিয়েছে এমন দুটি সংস্থা, যারা ইতিপূর্বে, ঠিক এ ভাবে যাত্রার ব্যাপারে কখনই উদ্যোগী হননি। এঁরা হলেন অনামিকা কলা সঙ্গম এবং আলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

অনামিকা কলা সঙ্গম যদিও মূলত হিন্দি ভাষাভাষী মানুষ পরিচালিত সংস্থা, তবুও এঁদের বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি যথেষ্ট। এঁরা বিভিন্ন সময়ে, শুধু কলকাতায় নয়-গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এমন কি বাছাই করা কোনো নাট্যগোষ্ঠীর নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করে থাকেন। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসারের আকাঙ্ক্ষা থেকে এই প্রতিষ্ঠান বার কতক যাত্রাও করিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তরুণ অপেরার নাম করা যায়। এবার এঁরা এই প্রথম ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যাথিড্রাল চার্চ প্রাঙ্গণে যাত্রা উৎসব করলেন। সেই সঙ্গে এই দিন থেকেই রবীন্দ্রসদনের বিপরীত ময়দানে ভবানীপুরের আলাপ গোষ্ঠীও যাত্রা উৎসব করেছেন। যাত্রা মরশুম শুরুর প্রাক্‌লগ্নে,একই তারিখে পাশাপাশি দুটি প্যান্ডেলে যাত্রা উৎসবের আয়োজন এই প্রথম।

যে সময়ে যাত্রার আকাশে একরাশ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ, যে সময়ে যাত্রার বাজার অন্তত আসাম ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে, যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত, সেই সময়ে এক সঙ্গে দুটি নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এই যাত্রাপ্রীতি নিঃসন্দেহে সুখের।

যাত্রা উৎসবে যাত্রা পালার এবং সামগ্রিক চেহারার উন্নতি কামনা করে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পুরস্কার দেবার একটা মানসিকতা অনেক-দিন আগেই দেখা দিয়েছে; কিন্তু এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সেই ভাবনার মধ্যে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষ্য করা গিয়েছে।

অনামিকা কলা সঙ্গম আয়োজিত বঙ্গীয় যাত্রা উৎসবে পাঁচজন বিচারকের বিচারের ওপরে চারটি বিভাগে যে পুরস্কার তুলে দেওয়া



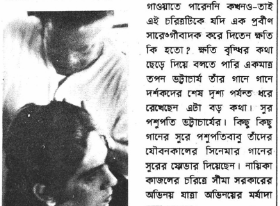
পালা: পুরস্কার অর্থে বাদ্যযন্ত্রের পরীক্ষা

হয়েছে, সেই পুরস্কারের নতুন রূপ হলো 'নগদ অর্থ'। আলাপ গোষ্ঠী অবশ্য এ ধরনের কোন পুরস্কারের আয়োজন করেননি। এঁরা এই উৎসব থেকে যে অর্থ লাভ করেছেন, তার একটি অংশে যাত্রার দুঃস্থ শিল্পী-কলাকুশলীদের জন্য হাসপাতালে দুটি শয্যা সংরক্ষণ করবেন।

যদি একক কোনো যাত্রা প্রতিষ্ঠান এবারে যাত্রা মরশুম সূচনা করার গৌরব অর্জন করে থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নট্ট কোম্পানী। বলা বাহুল্য, ছুটি ও খুশির যে কটা দিন মহাপূজাকে কেন্দ্র করে মানুষ উপভোগ করেছেন, সেই কটা দিন নট্ট কোম্পানীই একমাত্র যাত্রা প্রতিষ্ঠান, যাঁরা সেই খুশি বিতরণের ব্যাপারে ছিলেন তৎপর। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ,দশমী তিথিতে নট্ট কোম্পানী অন্য যাত্রা দলের মত বায়না নিয়ে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার অজস্র আবেদন গ্রহণ করেননি। কোনরকম প্রলোভনে নট্ট কোম্পানী মহাপূজার এই চারদিন সংস্কৃতির পীঠস্থানকে ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েননি। কলামন্দিরে নট্ট কোম্পানী প্রযোজিত 'ধর্মসিংহাসন' এবং সামাজিক পালা 'নিশিপুরের বৌ' পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরে কলকাতাবাসীদের নিয়মিত আনন্দ দিয়ে গেছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক পালা 'নিশিপুরের বৌ'-এর উদ্বোধন হয় কলামন্দিরে।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কলামন্দিরের দর্শক আসনে বসে নট্ট কোম্পানীর 'ধর্মসিংহাসন' নাটক উপভোগ করতে দেখেছিলাম খ্যাতিমান সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। ইতিমধ্যে যাত্রা জগতের একাধিক নায়ক, নায়িকা, প্রযোজক, পালাকারকে দেখেছি এই পালা দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে। পুরোধা প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ দেখার আগ্রহ যে সতীর্থদের থাকে নিজের চোখে তার প্রমাণ পেয়েছি। দেখেছি প্রতিটি দর্শকের মুখে তৃপ্তির হাসি। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন, একটানা সাড়ে তিন ঘন্টা কখন যে কেটে গেছে তা বুঝতেই পারেননি তিনি।

এবার এই খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও এক খ্যাতিমান চিত্র নায়কের নাম, তিনি বসন্ত চৌধুরী। যাত্রা অভিনয়ে বসন্তবাবু একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন এ অভিমত সকলের।



মেক-আপ নিচ্ছেন শিল্পী

মঞ্জরী অপেরার 'শিল্পী' পালার উদ্বোধনের ভিতর দিয়ে অনামিকা কলা সঙ্গমের উদ্যোগে বঙ্গীয় যাত্রা উৎসবের সূচনা হয়েছে। এই পালার পালাকার-নির্দেশক এক সঙ্গীতশিল্পীর করুণ জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন এই পালায়। গোটা পালায় পালাকার সুনীল চৌধুরী একরাশ সস্তা সেন্টিমেন্ট ছড়িয়েছেন কিন্তু গায়ক-নায়ক তপন ভট্টাচার্য পালাকারের সাধারণ নাট্যভাবনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর গানে-অভিনয়ে। শেষ দৃশ্যে সঙ্গীতসাধকের মৃত্যু আমাদের কোন পথের সন্ধান দিল?

যাত্রা পালায় একদা কালুয়া-ভুলুয়ার ভাঁড়ামি পালায় রাখা হতো হাস্যরস বিতরণের উদ্দেশ্যে। এখনও ঠিক তেমনি কিছু ভাঁড়ের আমদানী হয় যাত্রায়। এ পালাতেও তা হয়েছে। যা যুগপোযোগী ত নয়ই, এমনকি, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকেও তা প্রতিফলিত করেনি, ফলে গল্পটি মোটা দাগে ঝুলে গেছে। ওস্তাদজীকে পালাকার সংলাপের মাধ্যমে যতটা মহান করেছেন ততটা যদি তানপুরা নিয়ে কি ভাবে ওস্তাদরা বসেন সেটা শেখাতেন ভাল হতো। পালাকার ওস্তাদকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারেননি কখনও-তাই এই চরিত্রটিকে যদি এক প্রবীণ সারেঙ্গীবাদক করে দিতেন ক্ষতি কি হতো? ক্ষতি বৃদ্ধির কথা ছেড়ে দিয়ে বলতে পারি একমাত্র তপন ভট্টাচার্য তাঁর গানে গানে দর্শকদের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত ধরে রেখেছেন এটা বড় কথা। সুর পশুপতি ভট্টাচার্যের। কিছু কিছু গানের সুরে পশুপতিবাবু তাঁদের যৌবনকালের সিনেমার গানের সুরের ফ্লেভার দিয়েছেন। নায়িকা কাজলের চরিত্রে সীমা সরকারের অভিনয় যাত্রা অভিনয়ের মর্যাদা রক্ষা করেছে।

যাত্রারসিক

ফটো : গৌতম

এবারের বর্ষায় রবীন্দ্রসদন

রবীন্দ্রসদনের এবারের প্রযোজনা-'বর্ষার গান'। সকাল ও সন্ধ্যায় দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম অংশটি নজরুল, অতুলপ্রসাদ, কাব্যগীতি সমন্বয়ে। দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যানাদের বর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গানগুলিকে আলোকে আনার প্রয়াসের জন্য অভিনন্দন রবীন্দ্রসদনের প্রতি রইল। বর্ষার রূপ প্রকাশে সুর ও বাণীর একসপেরিমেণ্ট রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্যদের দ্বারাও কতখানি সাফল্য এনেছিল তা এখানে কিছুটা আঁচ করা গেল।

সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলী সেনের দ্বৈত সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। পরে শ্যামলী সেনের একক গান আশানুরূপ নয়। 'ঘনমেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা' কীর্তনাঙ্গের গানটিতে তাঁকে অন্য গানগুলির তুলনায় উন্নীত করেছে। সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের গানগুলি কথা ও সুরের ভাবটি বজায় রেখেছিল। গৌড়মল্লার আশ্রিত 'ডাকে কোয়েলিয়া' বা 'কেগো গাইলে পথে'



দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

গানগুলিতে চমৎকার আবহাওয়া ছিল। 'যেভাবে মেঘেরা দল বেঁধে যায়' গানটিও ছবিটি ফুটিয়ে তোলে। অখিলবন্ধু ঘোষের 'বরষা সেথা নামে'তে মিয়াঁ কি মল্লারের রাগ অবয়বটিই প্রাধান্য পাচ্ছিল বেশি। সেভাবে 'বরষায় মেঘ ভেসে যায়' গানটিতে সুরদাসী মল্লারের সার্থক পরীক্ষাটি তাঁর দ্বারাই রচয়িতার সম্মান বাড়ায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বস্থানেই আছেন। নজরুলের 'এ ঘনঘোর রাতে' বা 'মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ' গান দুটিতে আত্মমগ্নতা থাকলেও পরের গানগুলি বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হল। পূরবী দত্তের 'এসো এসো সজল শ্যাম দেয়া' আনন্দ দিতে পেরেছে। দ্বিতীয় পর্বে অশোকতরু



গীতা ঘটক

বন্দ্যোপাধ্যায় ঋকবেদের মন্ত্রে রবীন্দ্র সুরারোপিত সংগীতটি শুধুই শ্রুতিমধুর। কথা বোঝা যায়নি। সমগ্রভাবে ভালো 'মোর ভাবনারে' গানটি। 'সঘন গহন রাত্রি' অতিরিক্ত ঢিমা লয়ে অন্য ভাব প্রকাশ করে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এখনও এমন একজন শিল্পী যাঁর কণ্ঠের সুর ম্লান হয়নি। যেখানে তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেরই ঐশ্বর্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর সবকটি গানই সমভাব বজায় রেখেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে সুর অনেকবার এদিক ওদিক হয়ে গেলেও গানগুলির ভাব পরিস্ফুটনের একাত্মতাটিই ষোল আনা পূরণ করেছে। কথার ও একসপ্রেশনের সদ্ভাব 'হে নিরুপমা' গানটিতে সুন্দরভাবে লক্ষ্য করা গেছে। গীতা ঘটক সঠিক সুরে গলা লাগাবার চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে যে বিচ্যুতি ঘটেছিল তার ফারাক শ্রুতির পরিমাপে নেওয়াই ভালো। 'আজি ঝড়ের রাতে' অভিসার কথাটি মধ্যম থেকে কোমল গান্ধারে সার্থকভাবে আসে। 'বন্ধু রহো রহো' গানটি খুবই সুরেলা কণ্ঠের, আন্দোলন ও দানাগুলিতে আয়াসহীন ছিল। সুমিত্রা সেন সহজ সরলভাবে তাঁর গানগুলিকে সুখশ্রাব্য করে তুলেছিলেন। 'আমি তখন ছিলেম মগন' গানটি অন্যান্য গানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গানে সেন্টিমেন্টটি এখন সুলভ। 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও', 'ছায়া ঘনাইছে' বা পূব হাওয়াতে দেয় দোলা' গানগুলিতে তাঁর বিগত দিনের জৌলুসটি আবার ফিরে এসেছিল সেদিন।

গৌতম ঘোষ

শেষ বসন্ত

আকাশের নীলে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ শরতের গানের রেশ নিয়ে পাখির পালকের মত যখন ভেসে বেড়াচ্ছে তখন 'ভোরভঈ' নিবেদিত অনুষ্ঠানের শিরোনাম 'শেষ বসন্ত'

তাই ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় যোগেশ মাইম হলে সংস্থার আয়োজন সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা সংশয় ছিলই। কিন্তু সংগীতের অফুরান আনন্দ সাগর থেকে উঠে আসা ফুলের মত এক ঝাঁক শিশুশিল্পীর নাচ গানের উদ্দাম প্রাণের ছোঁয়ায় প্রথম মুহূর্ত থেকেই সেই সংশয় অনেকটাই মুছে যায়।

শিশু শিল্পীদের সম্মেলক কণ্ঠে 'বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু', 'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি', ছোট্ট মেয়ে নবনীতা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'ছোট্ট খোকন লেখে চিঠি' – এই সব গানে কোন চটকদারি ছিল না, ছিল শিশুমনের সজীব স্ফূর্তিময় একটা আবেদন। সম্মেলক লোক-সংগীতের সঙ্গে লোকনৃত্য এবং দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানটিও ভালো লাগে।

একক কণ্ঠে গান গাইবার মত কণ্ঠের স্বচ্ছতা সেদিন শুক্লা মুখোপাধ্যায়ের ছিল না। তবুও তাঁর অভিব্যক্তিপূর্ণ রেওয়াজী কণ্ঠে পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে 'পাষাণে ভাঙালে ঘুম', 'কেন ফুটে কেন কুসুম ঝরে যায়', 'চিরদিন কাহারো সমান', 'করবী আমার করবীকে ঢেকে দিও না' এই গান চারটিকে তিনি ভাবের গভীরতায় পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

এদিনকার অনুষ্ঠান শেষ হয় শুক্লা মুখোপাধ্যায়ের সংগীত এবং বুলবুল মুখোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিচালনায় নজরুলের গান নিয়ে রচিত 'শেষ বসন্ত' নৃত্যনাট্যটি দিয়ে। এক নিঃসঙ্গ বাঈজীর জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে গড়ে তোলা নিতান্ত মামুলি একটি গল্পকে রূপ দেওয়ায় সংস্থার শিল্পীদের সযত্ন নিষ্ঠার কোন অভাব ছিল না। বাঈজীর ভূমিকায় বুলবুল মুখোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তিপূর্ণ সাবলীল নৃত্যশৈলী সহজেই আসরের পরিবেশকে বিষণ্ণ আর্তিতে ভরে তুললো। এমনি অন্তর্মুখী একটি চরিত্রের প্রেম ও প্রেমহীনতাকে তিনি যেভাবে বাঙ্ময় করে তুললেন তা নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা দিতে পেরেছিল। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দেবীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, জোনাকি বিশ্বাস ও জয়তি ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখের দাবি রাখে। সংগীতাংশে শুক্লা মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা হাজরা, সৌমেন মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানে আন্তরিক অনুশীলনের ছাপ যতটা ছিল নজরুলগীতির মেজাজ সবক্ষেত্রে ততটা ছিল না।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ছিল, শাওন গগনে মেঘের ঘনঘটাও ছিল। ২৯ জুলাইয়ের সেই বাদল দিনের সকালে আনন্দমের প্রযোজনায় রবীন্দ্রসদনে সায়ণ নিবেদিত 'শ্রাবণের গান' নৃত্যগীতি আলেখ্যটি রচনায় সূক্ষ্মতা ছিল – নিবেদন অনেকাংশেই সার্থক হয়ে উঠেছিল।

শ্রাবণের কথা ও গান নিয়ে সংকলিত নৃত্যগীতি আলেখ্যর গানের অংশে অনবদ্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখলেন পূর্বা দাম। মাধুর্য আর লাবণ্যে সজীব ছিল শিল্পীর নিবেদনের প্রতিটি মুহূর্ত। তাঁর কন্ঠে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'তিমির অবগুন্ঠনে' এইসব বহুশ্রুত গানও নতুনতর মাত্রায় বাঙময় হয়ে উঠেছিল। সহজ সাবলীল ভঙ্গি ও সুরেলা কন্ঠে মনীষা মুন্সী একক ভাবে শোনালেন 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' এবং ' আমার দিন ফুরালো' গান দুটি। নিজস্ব একটি আবেদন ধরা পড়েছিল শিল্পীর নিবেদনে। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 'আমার যে দিন ভেসে গেছে' গানটিতে প্রাণবন্ত ছিলেন। সুনীল মল্লিকের কন্ঠে এ দিন স্বাভাবিক স্ফূর্তি না থাকায় রবীন্দ্রগানের আবেদন ফুটল না। দীপক রুদ্রের গান অত্যন্ত সাধারণ মানের।

রেখা মৈত্রের নৃত্য পরিকল্পনায় সংবেত নাচগুলিতে ভারসাম্যের অনেকটাই অভাব ছিল। তুলনায় একক নাচের অংশে শিল্পীরা সাবলীল ছিলেন। 'তিমির অবগুন্ঠনে', 'মোর ভাবনারে' এবং 'যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়' গান তিনটির সঠিক বোধ নাচের মধ্যে সঞ্চালিত করতে পেরেছেন রেখা মৈত্র। কন্যাকুমারী মুখোপাধ্যায়ের 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক' গানের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তি ছিল অর্থময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'উতল ধারা বাদল ঝরে' গানটিকে নৃত্যছন্দে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন সুমিতা সিনহা। মধুমিতা মুখার্জি ও সুতপা কুন্ডুর মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ধরা পড়েছে। অন্য শিল্পীরা এখনও অপরিণত।

অমল মুখোপাধ্যায়

ফটো : সুদীপ চট্টোপাধ্যায়

‘এক্কা’ পরিবেশিত ‘মহাকাশের গান’

গত ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭-৩0টায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ও সেন্টার ফর কালচারাল কমিউনিকেশনের আয়োজনে ‘এক্কা’ গোষ্ঠী পরিবেশন করলেন তাঁদের অভিনব উপস্থাপনা ‘মহাকাশের গান’। মহাকাশকে বিষয়বস্তু করে এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্ভবত এই প্রথম। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে এর আগেও ‘মহাকাশের নক্ষত্র’ দেখার সংগে বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু ঐ রকম একটা ভাবগম্ভীর থমথমে অজানা জিনিস জানার আগ্রহে অপেক্ষা করে, মহাকাশের নক্ষত্র দেখার সংগে গান শোনা এই প্রথম। যদিও যথাযথ পরিবেশ, শ্রোতা, অবস্থা এবং ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি মন ভরাতে পারল না। এই অনুষ্ঠানটির ভাল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ার কারণ দুর্বল গীতরচনা, দুর্বল সুরসৃষ্টি এবং গায়ক গায়িকার বেসুর কণ্ঠ দান। এর মধ্যে অবশ্য যন্ত্রসংগীত প্রয়োগ অনুষ্ঠানটির উপভোগ্য অংশ। গানের সুরকার আধুনিক প্রচলিত হিন্দি ও বাংলা গানের সুরের অনুকরণ করেছেন। যা অনেক সময় শ্রুতিমধুর হয়নি। তবে এর মধ্যে ‘এক্কা একদল জংগী নিয়ে গড়া’ গানটি শুনতে মন্দ লাগে না। অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন রীতা সেন, সমীর ঘোষ, তপন মান্না, ঝুনু, বাবলু ভট্টাচার্য, জয় অধিকারী, শীতল দাস, সুব্রত সেনগুপ্ত, অভিজিৎ অধিকারী, ডাঃ জ্যোৎস্না গুপ্তা, সূর্য ঘোষ, প্রচেত গুপ্ত, জহর সেনগুপ্ত এবং পুষ্কর গুপ্ত।

অনুষ্ঠানটির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য।

মাসকারেড-এর ‘একযুগ’

গত ৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় অ্যাকাডেমী মঞ্চে মাসকারেড তাঁদের প্রযোজনা ‘একযুগ’ নাটক মঞ্চস্থ করলেন। ‘একযুগ’ অমল মজুমদারের একটি বলিষ্ঠ নাটক। ওর আরও দু'চারটে নাটকের প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যেমন ‘ফুলগুলি সরিয়ে নাও’ প্রভৃতি। নাটকের বক্তব্য এবং কাহিনী নির্বাচনে শ্রী মজুমদার সিদ্ধহস্ত। তবে ওঁর নাটকের বিন্যাসে অবিন্যস্তভাব কোথাও কোথাও ফুটে ওঠে। নাটকটি ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে – এক বিখ্যাত সাংবাদিকের ড্রইংরুমে তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে এক তরুণ সাংবাদিক। তাদের আলোচনায় ৭0 দশকের প্রথমভাগে সন্ত্রাসবাদী নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিপ্লবী মুখগুলিকে স্মরণ করা হয়েছিল। নাটকের ফ্ল্যাশব্যাক অংশে স্থান পেয়েছে নকশালবাড়ি আন্দোলনের একটি খন্ড অংশ। যার মধ্য দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরার চেষ্টা করছেন শিল্পসম্মতভাবে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। যুবকদের আত্মহননের ছবি, তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের সংশোধনবাদী মনোবৃত্তি, বিক্ষুব্ধ বামপন্থীদের সঠিক পথ খোঁজার বিফল চেষ্টা, পুলিশি অত্যাচার, নকশালপন্থী বিপ্লবীদের বাঁচাতে সাধারণ মানুষের অকৃপণ প্রচেষ্টা এবং সমাজবিরোধীদের সংগে ডানপন্থীদের যোগসাজসে নকশালবাড়ি আন্দোলনের চিন্তাধারার পবিত্রতা হনন। ফ্ল্যাশব্যাক শেষে নাটক ফিরে এসেছে বর্তমানে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পলাতক বিপ্লবী নেতা সফল চিত্র পরিচালনার জন্য সরকারি পুরস্কার গ্রহণ করছে এবং সেই চিত্র পরিচালক জানায় তার পরবর্তী ছবি সেই ৭0 দশককে নিয়ে। এখানেই নাটকের ইতি টেনেছেন নাট্যকার। নাট্যকার নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, কেবলমাত্র ‘বৃজু’ চরিত্র সৃষ্টিতে ওঁর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবটি বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে।

আলো (কনিষ্ক সেন) বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে নাটকে। মঞ্চ (শুভাপ্রসন্ন) জোনালভাবে ব্যবহার করা হয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী। নাটকের রুক্ষতা মঞ্চসজ্জায় প্রকাশ পেয়েছে। ধ্বনি (স্মারিয়ন রেডিও) এবং আবহসংগীত (মুরারী রায়চৌধুরী) যথাযথ। নাট্যপরিচালকের (প্রদীপ দাশগুপ্ত) কিছু কিছু কম্পোজিশন-এর ব্যবহার ভাল, কোনো কোনো স্থানের সিচুয়েশন সৃষ্টিতে বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

অভিনয়াংশে সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকেই যে যার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। তবুও বিশেষ করে মনে দাগ কেটেছেন প্রণব ঘোষ (কালী মাস্টার), শিপ্রা সাহা (কুসুম) গংগাপাল (পাখি), প্রতিমা দাশগুপ্ত (কুসুমের মা), শমিতা চট্টোপাধ্যায় (বিলু) ও কৌশিক সরকার (সঞ্জয়)। এ ছাড়া সুঅভিনয় করেছেন তন্ময় রায়, দীপ্তেন্দু ব্যানার্জি, রতন সরকার, শ্যামল দাশ, প্রদীপ দাশগুপ্ত, অরুণ নন্দী, মুকুল বসু, সুভাষ সরকার, প্রবীর পাল, শুভ গুপ্তভায়া। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে ছিলেন অরুণ কর, শংকর রায়, তরুণ নাগ, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী দত্ত, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশংকর মল্লিক, যোকিম পল অ্যান্টনী, অর্ধেন্দু ব্যানার্জি ও শরৎ কোলে।

দীপক পোদ্দার

এ পক্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

মঞ্চ

১ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে বিশ্ববীণা সংস্থার সংস্কৃতি-সন্ধ্যা, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ক্যাম্প গোষ্ঠীর নাটক, মুক্তাংগনে নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের নাটক গাম্বুখেলা।

২ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে আই সি সি সোশ্যাল কমিটির অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে থিয়েট্রন গোষ্ঠীর নাটক, শিশির মঞ্চে ঋত্বিক সাউথ গোষ্ঠীর নাটক মাদার, মুক্তাংগন মঞ্চে রঙরূপের নাটক ক্লাউন, বিজন থিয়েটারে কবচকুন্ডল সংস্থার নাটক।

৩ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে গুজরাট সাহিত্য মন্ডলের অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে পি এল টি-র নাটক, মুক্তাংগনে শৌভনিকের নাটক অবশেষে, বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিটের নাটক বিলকিস বেগম।

৪ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে সকালে ভাবনা থিয়েটার গ্রুপের নাটক, সন্ধ্যায় চিত্রা সংগীত মঞ্জিল সংস্থার সংগীতানুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে সকালে চার্বাকের নাটক — সন্ধ্যায় বহুরূপীর নাটক, শিশির মঞ্চে ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্মোৎসব উদযাপন, মুক্তাংগনে শৌভনিকের নাটক অবশেষে, বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিটের নাটক বিলকিস বেগম।

৫ নভেম্বর : অ্যাকাডেমিতে লাইমলাইট গোষ্ঠীর নাটক, শিশির মঞ্চে অংগীকারের নাট্যানুষ্ঠান, মুক্তাংগনের নাটক মাধবীলতা, বিজন থিয়েটারে অর্ণব ফাইন আর্টস সংস্থার একাংক নাট্যোৎসব।

৬ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে শিল্পী যাযাবর সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার কমিউনের নাটক, শিশির মঞ্চে অভ্যুদয় গোষ্ঠীর নাটক, মুক্তাংগনে ইন্ডিয়ান কালচারাল ফোরামের নাটক কমলার আত্মদর্শন, বিজন থিয়েটারে গ্রন্থশ্রী পাঠাগারের অনুষ্ঠান।

৭ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের নাটক, অ্যাকাডেমিতে নান্দীকারের নাটক, শিশির মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মুক্তাংগনে দৃশ্যকাব্য গোষ্ঠীর নাটক গুরু ও গণিকা, বিজন থিয়েটারে বিনোদন সংস্থার নাটক।

৮ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে রবিবিতান গোষ্ঠী নিবেদিত অনুষ্ঠানে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান, ভি বালসারার যন্ত্রসংগীত এবং আভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের শেষ বর্ষণ, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক সন্ধ্যায় – সকালে পঞ্চম বৈদিকের নাথবতী অনাথবৎ, মুক্তাংগনে শৌভনিকের নাটক অবশেষে।

৯ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে ইমন কল্যাণ মিউজিক স্কুলের অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে চেনামুখ গোষ্ঠীর নাটক, শিশির মঞ্চে নন্দক সংস্থার নাটক, মুক্তাংগনে নাট্যরংগ সংস্থার নাটক বীরশামুন্ডা, বিজন থিয়েটারে পি এ টি গোষ্ঠীর নাটক।

১0 নভেম্বর : অ্যাকাডেমিতে পি এল টি-র নাটক, মুক্তাংগনে শৌভনিকের নাটক অবশেষে, বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিটের নাটক বিলকিস বেগম।

১১ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে সকালে আমরা সকলে সংস্থার অনুষ্ঠান – সন্ধ্যায় আরোহী গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে সকালে সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসংগীত – মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের নাচ এবং রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, শিশির মঞ্চে ঐকতান গোষ্ঠীর নাটক পাহাড়ী বিছে, মুক্তাংগনে শৌভনিকের নাটক অবশেষে, বিজনে থিয়েটার ইউনিটের নাটক বিলকিস বেগম।

১২ নভেম্বর : অ্যাকাডেমিতে সুন্দরমের নাটক, শিশির মঞ্চে মাস থিয়েটার গোষ্ঠীর নাটক, মুক্তাংগনে রূপদক্ষের নাটক অপভ্রংশ, বিজন থিয়েটারে অর্ণব ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির একাংক নাট্যোৎসব।

১৩ নভেম্বর : অ্যাকাডেমিতে চেতনার নাটক, শিশির মঞ্চে থিয়েটার ইউনিটের নাটক নিরস্ত্র, মুক্তাংগনে রংগনাট্য গোষ্ঠীর নাটক অজানা গপ্পো, বিজন থিয়েটারে মিনি নাট্যগোষ্ঠীর নাটক।

১৪ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে উত্তরণ নাট্যসংস্থার নাটক, অ্যাকাডেমিতে ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের নাটক, শিশির মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মুক্তাংগনে সংকল্প গোষ্ঠীর নাটক, বিজন থিয়েটারে সায়কের নাটক অনুবীক্ষণ।

১৫ নভেম্বর : রবীন্দ্রসদনে সারথি নিবেদিত দুদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম সন্ধ্যায় সুরসাগর জগন্ময় মিত্রের গান ও আবৃত্তির আসর, অ্যাকাডেমিতে নান্দীকারের নাটক, শিশির মঞ্চে সৃজন সাংস্কৃতিক সংস্থার সংস্কৃতি সন্ধ্যা, মুক্তাঙ্গনে নাট্যায়নের নাটক বৃশ্চিক।

বেতার

১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৯-১৫ ও রাত ১০-১৫।

২ নভেম্বর, শুক্রবার : এ. কাননের খেয়াল রাত ৯ টায়, রাত ৮.০০ বাংলা নাটক 'মহুয়া'

৩ নভেম্বর, শনিবার : প্রসাদ সেনের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, বিকেল ৩-০০ বাংলা নাটক – 'ক্ষরিত সংলাপ'।

৪ নভেম্বর, রবিবার : পূরবী দত্তের ভজন সকাল ৭-১৫ ও নজরুল গীতি রাত ১০-৫০, সকাল ৮-০০টা ১৫মিনিটের বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান 'এই আমরা' (রচনা – সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা – অজিত মুখোপাধ্যায়), দুপুর ২-৩৫ বাংলা নাটক 'কিছু অলৌকিক'।

৫ নভেম্বর, সোমবার : মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক গান সকাল ৮-১৫ ও নজরুল গীতি রাত ১০-১৫, রাত ৮টায় কথিকা।

৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার : পূর্বা দামের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, অভিজ্ঞানে রাত ৯-৩০ 'আমাদের শিশুসাহিত্যে রূপকথা কি অচল' শিরোনামের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৭ নভেম্বর, বুধবার : জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ভজন সকাল ৭-১৫ ও আধুনিক রাত ১০-৫০।

৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার : বিমলভূষণের ভজন সকাল ৭-১৫ ও নজরুল গীতি রাত ১০-৫০।

৯ নভেম্বর, শুক্রবার : অরুণ ভাদুড়ীর খেয়াল রাত ৯টায়, বাংলা নাটক 'বিন্দুর ছেলে'।

১০ নভেম্বর, শনিবার : কবি মজুমদারের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০।

১১ নভেম্বর, রবিবারঃ সকাল ৮টা ১৫ মিনিটের বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান 'এই আমরা', দুপুর ২-৩৫ এ বাংলা নাটক 'অন্তরে রাধা'। রাত ৯-২০ অমর পালের লোকগীতি।

১২ নভেম্বর, সোমবার : উৎপলা সেনের ভজন সকাল ৭-১৫ ও আধুনিক গান রাত ৯-২০।

১৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার : পূরবী মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, রাত ৯-৩০ অভিজ্ঞান।

১৪ নভে র, বুধবার : স্বপ্না ঘোষালের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, রাত ৮-০০ কথিকা 'নারী স্বাধীনতা দেশে দেশে' – অংশ নেবেন ডঃ রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার : সুবিনয় রায়ের রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান সকাল ৭-৪০।

সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশি ও লগ্নফল

১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৪

মেষ ঃ পারিবারিক ভোগ-সুখ বৃদ্ধি পাবে। শরীর পূর্বের তুলনায় ভাল। আর্থিক শুভ। হঠাৎ কিছু উপরি লাভ হতে পারে। অযথা অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে নিজের ক্ষতির বিষয়ে সাবধান। সতর্ক না হলে অপযশ হতে পারে। শুভ তারিখ – ২, ৪, ৭, ৯, ও ১৩। মেষ লগ্নের জাতিকা সতর্ক না হলে কোন সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। ১১ বৎসরের উর্ধ্বে কোন সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহের ফলে নিজের ক্ষতির বিষয়ে সাবধান।

বৃষ ঃ যাদের জন্ম কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাদের ভোগ-সুখ বৃদ্ধি এবং রোহিনী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে যাদের জন্ম তাদের হ্রাসবৃদ্ধির যোগ আছে। মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হবে। নিজের বাকচাতুর্যে শত্রুবশ ও কার্যসিদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। বুকের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। শুভ তারিখ – ১, ২, ও ১২। বৃষ লগ্নের জাতিকার অন্যের ঝামেলা নিজের কাঁধে তোলার আগে ভাল করে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করলে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। ৬ বৎসরের নিচে সন্তানের পীড়ায় অর্থব্যয় যোগ আছে।

মিথুন ঃ পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্ম যাদের তাদের মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং মৃগশিরা ও আদ্রা নক্ষত্রে জন্ম হলে হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মচারীর মন জয় করতে পারলেও বিশেষ কিছু উন্নতি ঘটবে না। আর্থিক টানাটানি থাকবে। বিবাহের যোগাযোগ হওয়ার যোগ আছে। শুভ তারিখ ১, ২ ও ১০। মিথুন লগ্নের জাতিকার অযথা বিরোধ এড়িয়ে চলা উচিত। প্রতিবেশীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। স্বামীর উন্নতির যোগ আছে।

কর্কট ঃ মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কোন পূর্বোপকৃত ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে। কর্মে বা ব্যবসায়ে হঠাৎ কোন পরিবর্তন হতে পারে। ঋণ শোধ করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। শুভ তারিখ – ৩, ৪, ৮, ও ৯। কর্কট লগ্নের জাতিকার রক্তচাপ ও বায়ুঘটিত পীড়ায় কষ্ট হবে। বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশায় সাবধান। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়।

সিংহ ঃ আর্থিক সুরাহা বিশেষ না হলেও সম্মানবৃদ্ধির যোগ প্রবল। ব্যবসায় নতুন কোন যোগাযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা এবং দাম্পত্য কলহ হতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা না করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুভ তারিখ – ৪, ৫, ৮ ও ১১। সিংহ লগ্নের জাতিকার আত্মীয় বিরোধিতা চলবে। নিজের বুদ্ধিবলে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারবেন। নিজের শরীর পূর্বের তুলনায় ভাল হলেও সন্তান বা স্বামীর শরীর চিন্তার কারণ হতে পারে।

কন্যা ঃ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম যাদের তাদের সম্মানবৃদ্ধি এবং হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম যাদের তাদের আত্মীয়-বন্ধু অথবা অন্য কোন ব্যক্তি-দ্বারা বিরোধিতার সৃষ্টি হবে। অতি তুচ্ছ কারণে মানসিক কষ্ট পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের অনিচ্ছায় কিছু ঘটার বিষয়ে সাবধান। শুভ তারিখ ১, ২, ৭, ও ২১। কন্যা লগ্নের জাতিকা পুরনো রোগে কষ্ট পেতে পারেন। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হতে পারে। ধনলাভের যোগ থাকলেও বিশেষ কারণে সঞ্চয় হবে না। সন্তানের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেতে পারেন।

তুলা ঃ আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও তাদের বিরোধিতাসুলভ মনভাবে মানসিক কষ্ট। সচেষ্ট হলে ক্ষমতাবান ব্যক্তির অযাচিত করুণা-লাভ ঘটতে পারে। এপক্ষে কোন নতুন ব্যবসা বা শুভ কার্যের সূচনা করলে ভবিষ্যতে শত্রুতাবৃদ্ধির যোগ আছে। শুভ তারিখ ২ ৯ ও ১৫। তুলা লগ্নের জাতিকার নিজের কার্যসিদ্ধি এবং স্বামী বা সন্তানের কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তি ঘটতে পারে। শারীরিক শুভাশুভ মিশ্র ফল।

বৃশ্চিক ঃ যাদের জন্ম বিশাখা ও অনুরাধা নক্ষত্রে তাদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হলে নানাবিধ সুখ বিশেষ কিছু লাভ ও প্রাপ্তির যোগ আছে। এপক্ষে স্বার্থান্বেষী লোক থেকে সাবধান। চর্মরোগ হতে পারে। শুভ তারিখ ২, ৫ ও ১২। বৃশ্চিক লগ্নের জাতিকার নানাবিধ অশান্তি অবৈধ প্রেম অথবা কুসংসর্গে ক্ষতি হবার যোগ আছে। কয়লা ও খনিজ তেলের ব্যবসায় অযাচিত লাভের যোগাযোগ আসতে পারে।

ধনু ঃ পারিবারিক, আর্থিক সর্ববিষয়ে শুভ। কর্মক্ষেত্রে সুনামবৃদ্ধির যোগ আছে। শত্রুরা পরাজিত ও বশীভূত হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অতি সাহসিকতার ফল বিষময় হতে পারে। পুরাতন বন্ধুর সাহায্যে কর্মে ও ব্যবসায় উন্নতির যোগ। শুভ তারিখ ৩, ৬, ৯ ও ১৩। ধনু লগ্নের জাতিকা স্বামীর সঙ্গে অযথা মনোমালিন্য এড়িয়ে চলুন। কোন সুযোগসন্ধানী পিঙ্গল বর্ণের মহিলাদ্বারা নিজের অথবা স্বামীর ক্ষতি হতে পারে। ১৩ থেকে ১৮ বৎসরের কোন সন্তানের কুসংসর্গে মেলা বিষয়ে পূর্ব থেকে সাবধান হওয়া উচিত।

মকর ঃ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যাদের জন্ম তাদের সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হলে ভোগবৃদ্ধির যোগ আছে। আর্থিক ও পারিবারিক শুভ। বৃহৎ যোগাযোগ আসতে পারে। এ পক্ষে বিবাহে ও নতুন ব্যবসায় প্রচুর লাভ হবে। শুভ তারিখ ১, ৩, ৭ ও ১০। মকর লগ্নের জাতিকার পুরনো কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে। যাদের বয়স ৩৯ থেকে ৬৫ বৎসরের মধ্যে তাদের আশাভঙ্গের যোগ আছে। সন্তানের শরীর শুভ।

কুম্ভ ঃ ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হলে ভোগ-সুখ বৃদ্ধি। পূর্বভাদ্র-পদ নক্ষত্রে জন্ম হলে হ্রাস বা ভয় বৃদ্ধির যোগ আছে। অযথা চিন্তা ও নিঃসঙ্গতা বোধ হতে পারে। সাবধান না হলে যশহানী ঘটবে। আত্মীয় বিরোধিতা ও আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। শুভ তারিখ – ৫, ৭ ও ১১। কুম্ভ লগ্নের জাতিকার বিপদের সময় কারো দ্বারা সাহায্যলাভ হতে পারে। আর্থিক সাহায্য লাভ হতে পারে। সতর্ক না হলে স্বামী অথবা সন্তানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি।

মীন ঃ এই পক্ষকালে হ্রাস এবং নিঃসঙ্গতা এত বেশি বৃদ্ধি পাবে যে তার ফলে শরীরের উপর চাপ পড়বে। আঘাতপ্রাপ্তিযোগ অথবা শরীরের কোথাও ব্যথা হতে পারে। শত্রুদের দ্বারা সম্মানহানির চেষ্টা হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। শুভ তারিখ – ১, ৮ ও ১৪। মীন লগ্নের জাতিকার বিভিন্ন ধরনের রোগে কষ্ট ভোগের যোগ আছে। ১২ বৎসরের উর্ধ্বে সন্তানের অবাধ্যতায় মানসিক কষ্ট পেতে পারেন।

শ্রী গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০১৯৯), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৭-২১৬৯, ২৭-৩০১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN

SUKANYA 1 NOVEMBER 1984 Declaration No. 42/84 Postal Regn. No. WB/CC-423 Rs. 3.50